আরক্ত রজনী

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

অণিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশকাল : শুভ রথযাত্রা, ১৩ আষাঢ় ১৩৬৪

প্রকাশক : শ্রীদ্বিজদাস কর, অণিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রীজয়ন্ত মুখোপাধ্যায়

মুদ্রাকর : শ্রীকুশধ্বজ মান্না, মান্না প্রিণ্টার্স
৬৭/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬

শ্রীযুক্তা রীণা মুখোপাধ্যায়

ও

শ্রীরবীন মুখোপাধ্যায়

যুগলেষু–

ঃ লেখকের কয়েকটি বই ঃ

রহস্যভেদী বাসব (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)

এখানে শ্বাপদ

মরণ দোলায় দোলা

জানু ভানু কৃশানু

রক্তাক্ত খাইবার

থৈ থৈ হাহাকার

লিঙ্কনের শেষ বিচার

শেষ পর্যন্ত সুকুমারের মনস্কামনা পূর্ণ হল।

নৈনিতালের প্রশংসা সে শুনে আসছিল সেই ছোটবেলা থেকে। রাঙামাসি নৈনিতাল গিয়েছিলেন। সেখানে ছিলেন দিন দশেক। হাত-মুখ নেড়ে প্রশংসার বান ডাকিয়ে দিচ্ছিলেন পাহাড়ী শহরটির। সেই প্রথম নৈনিতালের কথা শুনল সুকুমার। তারপর অজস্রবার চেনা ও অচেনা অসংখ্য মানুষের মুখ থেকে।

সুকুমার স্থির করেই রেখেছিল নৈনিতাল একবার যেতে হবে। তার ভাগ্য ভালো বলতে হবে। গ্র্যাজুয়েট হয়ে পড়াশোনার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে, প্রথম চেষ্টাতেই তার চাকরি হল রেলে। বাবা রেলে কাজ করতেন। দাদারা রেলে কাজ করেন, এই বিভাগে চাকরি পেয়ে যাবে এই আশা যে একেবারেই ছিল না তা নয়। তবে যা দিনকাল পড়েছে, এখন না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

রেলে চাকরি পাবার পর নৈনিতাল যাবার সম্পর্কে সুকুমার নিশ্চিত হয়েছিল। ট্রেনের ভাড়া লাগবে না—এই সুবিধেটুকুই বা কজন পায়? কিন্তু তার এমন দুর্ভাগ্য, চাকরিতে যোগ দেবার পাঁচ বছর কেটে যাবার পরও সে যেতে পারল না। শীতকালে বরফের দেশে যাওয়া যায় না। গরমকাল প্রশস্ত সময়। গত পাঁচ বছরের প্রতি গরমকালে কোন না কোন অসুবিধার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সে। যাওয়া হয় নি।

এবার প্রথম থেকেই সুকুমার সতর্ক ছিল। অসুবিধার পাল্লায় যাতে না পড়ে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছিল। শেষ পর্যন্ত এপ্রিলের শেষে নৈনিতালে এসে উপস্থিত হল। এক মাস দশ দিনের ছুটি নিয়েছে। এতদিনের ছুটি পাওয়া রীতিমত কঠিন ব্যাপার। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পেরেছে।

দিন ছয়েক হল এখানে এসেছে। নৈনিতালের অপরূপ সৌন্দর্যে

প্রাণ ভরে অবগাহন করছে সুকুমার। উঠেছে 'সিলভার অ্যারো' হোটেলে। হোটেলটি ভালো। ফরেন টুরিস্টরা বা ভি. আই. পি'রা অবশ্য এখানে এসে ওঠে না। সে বৈভব তার নেই। তবে মধ্যবিত্তদের কাছে স্বর্গ। মধ্যবিত্ত বাঙালি হোটেল বলতে যা বোঝায় 'সিলভার অ্যারো' ঠিক তা নয়। কিঞ্চিৎ পাশ্চাত্য কেতাদুরস্ত।

হোটেলের অবস্থানও চমৎকার। কার্টার রোড আর হিলভিউ রোডের সংযোগে। প্রতি ঘরে বসে বিরাট ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোগুলোর মধ্যে দিয়ে তুষারের বর্ম-আঁটা পাহাড়কে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। অনেক বোর্ডার চাঁদনী রাতে হোটেলের বাইরে না গিয়ে ঘরে বসেই নৈনিতালের সৌন্দর্যসুধা পান করেন।

'সিলভার অ্যারো' হোটেলটি প্রতিষ্ঠা করে একজন গোয়ানিজ।

সুদূর গোয়া থেকে এখানে এসে কেন যে বাগ্রাঞ্জা হোটেল খুলে বসেছিল, তা বলা যায় না। বিশেষে সে মোটেই ব্যবসাদার ছিল না। পাঞ্জিমে ঠিকাদারের কাজ করত। অনেক টাকা খরচ করে হোটেল বাড়িটি তৈরি করেছিল সে। ব্যবসাও আরম্ভ করেছিল অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। মদ বাগ্রাঞ্জাকে অতলে তলিয়ে দিল।

বাজারে প্রচুর ধার। হোটেলের দরজা প্রায় বন্ধ হয়-হয়। বাগ্রাঞ্জা পাওনাদারের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে বেড়াতে লাগল। হোটেল বিক্রি করা ছাড়া আর কোন পথ তার সামনে খোলা রইল না।

দিলীপ মুখার্জি সেই সময় 'সিলভার অ্যারো'র একজন বোর্ডার ছিলেন। বাগ্রাঞ্জাকে তিনি হোটেল কিনে নেবার প্রস্তাব দিলেন। রেলের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোন বিষয় নিয়ে গোলমাল হওয়ায় চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। নিজের ভবিষ্যত কর্মপন্থা কি হবে সেই সম্পর্কে গভীর চিন্তা করবার জন্য নৈনিতাল এসেছিলেন। নিরিবিলিতে চিন্তা করার অনেক সুবিধা। চিন্তা বিশেষ করতে হল না এখানে। বাগ্রাঞ্জার শোচনীয় অবস্থা উৎসাহিত করল তাঁকে।

কথাবার্তা অবিলম্বে পাকা হয়ে গেল। হস্তান্তরিত হল 'সিলভার অ্যারো'। তারপর থেকে হোটেলটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। দিলীপ মুখার্জি নিজেই ম্যানেজারের পদটি গ্রহণ করেছেন।

বাঙালি ওনার বলেই বোধ হয়, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে সমস্ত বাঙালি এখানে বেড়াতে আসেন, তাঁদের অধিকাংশ 'সিলভার অ্যারো'তে আশ্রয় নেন। অবশ্য দু-বছর আগেকার মত এখন এখানে সহজে জায়গা পাওয়া যায় না, চিঠি লিখে মাসখানেক আগে থাকতে জায়গা বুক করে রাখতে হয়। সুকুমার তাই করেছিল।

বেশ মনের আনন্দে সুকুমার আছে নৈনিতালে। আটটার সময় হোটেল থেকে বেরোয় প্রতিদিন। ফিরতে এগারোটা, সাড়ে এগারোটা হয়ে যায়। পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। প্রচণ্ড খিদে হচ্ছে। চমৎকার স্বাস্থ্য নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবে, এ বিশ্বাস সুকুমারের আছে। দুপুরে বই পড়ে আর জানলার চৌক কাঠামোর মধ্যে দিয়ে পাহাড়কে দেখেই কাটিয়ে দেয়। বিকেলে বেরোয় আবার অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে বেড়াবার জন্য।

তখন সন্ধ্যা সাতটা। যথানিয়মে সুকুমার বেড়িয়ে ফিরছে হোটেলে, পার্লার পেরিয়ে ওপরে উঠতে যাবে, কাউন্টারের দিকে দৃষ্টি পড়তেই থেমে গেল। কি আশ্চর্য! তার অত্যন্ত এক পরিচিত ভদ্রলোক দিলীপ মুখার্জির সঙ্গে কথা বলছেন। ওপরে আর উঠল না, পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল কাউন্টারের কাছে।

মুখার্জি সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তখন বলছেন, আপনি বাঙালি, এই বিদেশে আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আমি সত্যি আনন্দিত হতাম। কিন্তু নিরুপায়, কোন ঘর খালি নেই হোটেলে।

ভদ্রলোক বললেন, কোন ব্যবস্থা কি করা যায় না?

উঁহু। আজ কম করেও দশজনকে ফিরিয়েছি। আপনারা তো মশাই আমার লক্ষ্মী, আপনাদের অনর্থক ফিরিয়ে দিলে তো আমারই ক্ষতি।

সুকুমার বলে উঠল, আপনি একটা সিঙ্গল খাট বা চৌকির ব্যবস্থা

করে দিতে পারেন, তাহলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

ভদ্রলোক চমকে মুখ ফেরালেন। তারপর সহর্ষে বলে উঠলেন, একি! কুট্টু, তুমি···

আস্তে, আস্তে মধুসূদনবাবু, আমার ডাকনামটা আর এখানে প্রচার করে দেবেন না। কখন এলেন?

এই তো আসছি। ইনি বলছেন, ঘর খালি নেই। রাত হয়ে গেল, কি যে করব বুঝতে পারছি না। তুমি কবে এলে?

দিন কয়েক হল।

দিলীপ মুখার্জি বললেন, দিন কয়েক আগে আমায় জানিয়ে রাখলে এই অসুবিধায় আপনাকে পড়তে হত না।

দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে মধুসূদনবাবু বললেন, আসবার কোন স্থিরতা ছিল না। হঠাৎ ছুটি পেয়ে যাওয়ায় ট্রেনে চেপে বসেছিলাম আর কি।

মিস্টার মুখার্জি···

সুকুমারের দিকে তাকিয়ে মুখার্জি বললেন, বলুন?

এখুনি একটা সিঙ্গল খাট বা চৌকির ব্যবস্থা করতে পারবেন কি?

কি করবেন?

জোগাড় করে দিতে পারবেন কিনা বলুন না?

পারব না কেন?

তাহলে তো কোন সমস্যাই রইল না। এ ভদ্রলোক সহজেই আমার ঘরে থাকতে পারবেন।

মধুসূদনবাবু যেন হাতে চাঁদ পেলেন। এক মুখ হেসে বললেন, বাঁচালে ভাই। ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, নইলে এই বিদেশে কোথায় যে হাতড়াতাম।

দিলীপ মুখার্জিও হাসলেন।

যাক, সমস্যার সমাধান তাহলে হয়ে গেল। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে একটা চৌকি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আসুন মধুসূদনবাবু, আমরা ঘরে যাই।

আপনি যান, মালপত্র পাঠিয়ে দিচ্ছি ঘরে।

মধুসূদনবাবু সুকুমারকে অনুসরণ করলেন।

সুকুমারের ঘরখানা ছোট নয়, হেসেখেলে দুজনের সঙ্কুলান হয়ে যাবে।

মধুসূদনবাবুর সঙ্গে সুকুমারের যে প্রচণ্ড হৃদ্যতা আছে, তা কিন্তু নয়। সাধারণ মুখ-চেনাচিনি আছে বলা চলে। পথে-ঘাটে কালে-ভদ্রে দেখা হলে, কি খবর? ভালো তো?—এই ধরনের মামুলি কথাবার্তা হয়ে থাকে। একে মুখ-চেনাচিনি ছাড়া আর কি বলা চলতে পারে।

শুধু তার সঙ্গেই নয়, মুঙ্গেরের কোন বাঙালির সঙ্গে মধুসূদনবাবুকে কেউ কখনো হৃদ্যতা করতে দেখে নি। সুকুমারের মনে হয়েছে তাঁর চারপাশটা যেন পুরু রহস্যের আবরণ দিয়ে ঢাকা। ইচ্ছে করেই যেন তিনি কারুর সঙ্গে মিশতে চান না। তাঁর অতীত জীবনে এমন কিছু ঘটনা নিশ্চয় আছে, যা কারুর কাছে প্রকাশ হয়ে যাবার সম্ভাবনাকে রোধ করার জন্যই সকলকে এড়িয়ে চলেন। মধুসূদমবাবুর সম্পর্কে এই ধারণা সুকুমারের একার নয়, মুঙ্গেরের আরো অনেক বাঙালি ও অবাঙালির।

মধুসূদন গুপ্ত উচ্চতায় ফিট ছয়েক হবেন। রোদে-পোড়া তামাটে গায়ের রঙ। মুখ-চোখ ভালোই। এক মাথা কালো কোঁকড়া চুল। ঘন ঘন নস্যি নেন। চশমাও আছে চোখে। 'মুঙ্গের ট্রেনিং কলেজে' অধ্যাপনা করেন।

সুকুমার মধুসূদনবাবুকে দৈবাৎ আবিষ্কার করে। মুঙ্গেরের ছোটিকিলা বাড়ির বাসিন্দা সে। একদিন লক্ষ্য করল, একজন বাঙালি ভদ্রলোক বাজারের থলি হাতে ফিরছেন। শহরের কোথাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও প্রত্যেক বাঙালির সঙ্গে প্রত্যেক বাঙালির পরিচয় আছে।

উনি কে?

পরিচিত গোষ্ঠীর মধ্যে তো কেউ নয়, নিশ্চয় নতুন এসেছেন

শহরে। কলকাতায় কেউ কারুর খোঁজ রাখে না। আলাপের গণ্ডীকে বিস্তৃত করা তাঁরা পছন্দ করেন না। ছুটি পাশাপাশি ঘরে একই সময় শ্রাদ্ধ ও বিয়ের অনুষ্ঠান হতে বাধা নেই। কিন্তু প্রবাসী বাঙালির মনোভাবকে ওই দৃষ্টি-কোণ দিয়ে বিচার করা চলবে না।

সুকুমার তৎপর হল। নতুন একজন বাঙালি এসেছেন, বিশেষ তাদের পাড়ায়—সুতরাং উপযাচক হয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করা তার কর্তব্য। সে গেল তাঁর বাসায়। হাসি-মুখে নিজেব পরিচয় জানাল। আসবার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতেও ভুলল না।

মধুসূদন গুপ্ত সুকুমারের আপাদ-মস্তক দেখে নিলেন। গম্ভীর মুখে নিজের নাম বললেন। কলকাতা থেকে ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক হয়ে এসেছেন, তাও জানালেন। এবং পরিশেষে বললেন, তিনি ব্যস্ত মানুষ, গল্প-গুজব করে নষ্ট করার মত সময় তাঁর নেই। আরো যারা তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে উন্মুখ, তাদের যদি সুকুমার এই কথা জানিয়ে দেয়, তবে তিনি বিশেষ উপকৃত হবেন।

এই ধরনের পরিষ্কার ইঙ্গিত পেয়ে সুকুমার হতবাক্। ভদ্রলোকের শিষ্টাচার জ্ঞান একেবারেই নেই বুঝতে পারা যায়। সে চলে এসেছে। ছু-চার কথা শুনিয়ে আসবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু নিজের সংযমের রাশকে শেষ পর্যন্ত কড়া হাতে টেনে রাখল।

আর যায় নি। তবে পথে-ঘাটে দেখা হলে ভদ্রলোক মুখ ফিরিয়ে নেন নি। একটু হেসেছেন। ছু-চারটে কুশল প্রশ্ন করেছেন। সেই মধুসূদন গুপ্তকে সুদূর নৈনিতালের সিলভার-অ্যারো হোটেলের কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সুকুমার স্বাভাবিকভাবেই অবাক হয়েছিল।

তারপরই প্রতিশোধ নেবার ছুর্বার ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসল। প্রথম সাক্ষাতে মধুসূদনবাবু তার সঙ্গে ভালো করে কথা পর্যন্ত বলতে চান নি। সে আজ তাঁকে বিপন্ন অবস্থা থেকে উদ্ধার করবে। নিজের অসুবিধা করে, নিজের ঘরে স্থান দিয়ে বুঝিয়ে দেবে, তিনি একজন প্রকৃত ভদ্রলোকের সঙ্গে অত্যন্ত মন্দ ব্যবহার করেছিলেন।

রাত্রে মধুসূদনবাবুর সঙ্গে সুকুমারের কোন কথাই হল না। দীর্ঘ ট্রেন ভ্রমণের জন্য ক্লান্ত ছিলেন। খাওয়া-দাওয়া সারলেন সাড়ে আটটার মধ্যে। শুয়ে পড়লেন। দশ মিনিটের মধ্যে ভারি নিঃশ্বাস পড়ার শব্দ পাওয়া গেল—তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

তখন সবে ভোর হয়েছে। মধুসূদনবাবু সুকুমারকে ঘুম থেকে তুললেন, ওহে কুটু্‌, চল বেড়িয়ে আসি।

চোখ রগড়ে নিয়ে সুকুমার বলল, এই সাত সকালে বেড়াতে বেরুবেন কি! ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে যাবেন যে!

কোটের ওপর গ্রেট কোট চাপালেও সুবিধা হবে না বলছ?

এখন রাস্তায় নামার অর্থ হল নিউমোনিয়াকে দ্রুত আমন্ত্রণ করা। আপনি মাত্র গতকাল এসেছেন, এখানকার হালচাল জানেন না। আমি কিছু কিছু বুঝেছি।

এক টিপ নস্যি নাকে দিলেন মধুসূদন গুপ্ত। জানলার বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করে বললেন, আমার কথাবার্তায়, ব্যবহারে তুমি বোধ হয় অবাক হয়ে যাচ্ছ?

একটু হচ্ছি বইকি।

আমি একটু স্বতন্ত্র ধরনের। আর দশজনের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে ভালোবাসি না বললে ভুল হবে, আমি ভয় পাই।

ভয় পান! কেন?

এই কেন-র উত্তর দিতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে। তুমি নেহাত ছেলেমানুষ, সে-সমস্ত কথা তোমার কাছে নাই বা বললাম। তবে এইটুকু জেনে রাখো, একদিন আমি অত্যন্ত মিশুক ছিলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে কাটত বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে। সে একদিন গেছে—আর আজকে, আমার দিনগুলির রূপ অন্যরকম।

তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

একটু চুপ করে থেকে সুকুমার বলল, আমিই বোধ হয় মুঙ্গেরের প্রথম লোক, যার সঙ্গে আপনি ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলছেন।

কলেজের আওতার বাইরে তাই বটে। কলেজে আমায় অনেক কথা বলতে হয়। প্রতিদিন গোটা তিনেক লেক্‌চার থাকেই। কুট্টু, তুমি কিছু মনে কোরো না ভাই।

কিসের বিষয়ে?

আমার বাসায় গিয়েছিলে, আমি তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করি নি। আমি মর্মাহত। আমি কারুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে যে আনন্দ পাই, তা নয়, তিক্ত অভিজ্ঞতায় বিপর্যস্ত মন আমাকে নাড়া দিয়ে বলে, ভুলে গেলে সে-সমস্ত দিনের কথা! এই সামাজিক জীবরা তোমাকে সর্বহারা করে ছেড়ে দিয়েছে। তারপরই আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি।

আপনার জীবনে নিশ্চয় এমন কোন আঘাত আছে, যার জন্য আপনি মানুষের সঙ্গকে বিষবৎ এড়িয়ে চলতে চান।

তুমি ঠিকই ধরেছো। এক সময় মনে হয়েছিল কোথাও চলে যাই, যেখানে মানুষ নেই। প্রেম-ভালোবাসার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে, আড়ালে যেখানে কেউ বুকে মারবার জন্য ছুরি শাণায় না।

সুকুমার কথার মোড় ঘোরাল, নৈনিতালে এসে কেমন বোধ করছেন, বলুন?

খুব ভালো লাগছে। ভালো লাগছে বলেই তো তোমার সঙ্গে এতগুলো কথা বলতে পারলাম।

লবির ওয়াল ক্লকে সশব্দে সাতটা বাজল।

সুকুমার বাথরুমে গেল।

মধুসূদন ঘনঘন নস্যি নিতে লাগলেন।

দিন দুয়েকের মধ্যে বেশ হৃদ্যতা হয়ে গেল দুজনের মধ্যে।

এখানে-ওখানে চুটিয়ে বেড়াচ্ছেন।

এক-এক সময় সুকুমারের ইচ্ছে হচ্ছে মধুসূদন গুপ্তকে প্রশ্ন করে তাঁর জীবনের অন্ধকার দিক সম্পর্কে, আবার সে-ইচ্ছে দমন করে নিচ্ছে। যদি বিরক্ত হন, যেটুকু হৃদ্যতা হয়েছে, তাও ভেঙে যাবে।

বলতে গেলে আজ সারাটা দুপুর দুজনে লেকে বোটিং করে কাটালেন। নৈনিতালের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হল এই বোটিং। অত্যন্ত ভালো লাগে। ভারতের কোন শৈলাবাসে এমন চমৎকার লেক নেই।

তীরে ফিরে এসে মধুসূদন গুপ্ত বললেন, যারা নির্জনতা ভালোবাসে কয়েক বছর পরে তারা কেউ আর এখানে আসবে না।

লেকের জলে ভাসমান অসংখ্য বোটের দিকে তাকিয়ে সুকুমার বলল, সত্যি, অত্যন্ত ভিড় হয়ে গেছে।

দার্জিলিং-এর অবস্থা আরো খারাপ। গত বছর গিয়েছিলাম। তিন দিনেই হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। মানুষ আর মানুষ। দশমীর দিন প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় কলকাতার রাস্তা দিয়ে যেমন মানুষ চলে—ঠিক তেমনি। প্রতিটি রাস্তায় গায়ে গা ঠেকিয়ে চলেছে জনস্রোত।

অথচ শুনি ভালোভাবে বেঁচে থাকার মত পয়সা নাকি আমাদের কাছে নেই।

এক্সজ্যাক্টলি। আচ্ছা, এত পয়সা মানুষ কোথা থেকে পাচ্ছে বলতে পারো?

কথা বলতে বলতে দুজনে এগিয়ে চললেন।

মেঘলা আকাশ।

পরিষ্কার তকতকে রাস্তার ওপর দিয়ে হেঁটে চলতে ভালোই লাগছে।

কিছু দূর অগ্রসর হয়েছেন দুজনে।

ও মশাই, শুনছেন···

পিছন থেকে কে একজন ডাকল।

সুকুমার পিছন ফিরে দেখল, একজন চল্লিশের কোঠায় পৌঁছতে সামান্য বিলম্ব ভদ্রলোক হাত দশেকের ব্যবধানে রয়েছেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত। নিশ্চয়ই ওদের নয়, রাস্তায় আরো লোক রয়েছে, তাদের কাউকে ডেকে থাকবেন তিনি। সুকুমার মুখ ফিরিয়ে নিল।

শুনুন, আপনাদেরই বলছি।

ভদ্রলোক দ্রুতপায়ে এগিয়ে এলেন।

আমাদের!

আপনারা বাঙালি তো?

বাঙলায় কথা কলছি শুনতেই পাচ্ছেন। কি দরকার বলুন তো?

আমি বাঙালিদের সঙ্গ পাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছি মশাই! আপনাদের দেখে স্বজাতি মনে হল, তাই···

মধুসূদন গুপ্তর ভ্রূ কুঁচকে উঠল।

হাঁপিয়ে উঠেছেন কেন?

ভদ্রলোক মহা আশ্চর্য হলেন।

হাঁপিয়ে উঠব না! কি বলছেন! মাসখানেক হল এখানে এসেছি, কথা বলার একটা লোক পাচ্ছি না। আসুন না, ওখানে বসা যাক।

রাস্তার ধারে একটা বেঞ্চের দিকে ভদ্রলোক অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

অনিচ্ছার সঙ্গে মধুসূদন গুপ্ত সুকুমারকে সঙ্গে নিয়ে বসলেন বেঞ্চের ওপর। ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন। নাম মৃগাঙ্ক ঘোষ। খাস কলকাতার লোক। পৈতৃক সূত্রে একটা গেঞ্জির মিলের মালিকানা এখন তাঁর। বর্মায় গেঞ্জি সাপ্লাই করে প্রচুর পয়সা করেছেন। প্রতি বছর গরমকালে কোন না কোন শৈলাবাসে গিয়ে কম করেও মাস দুয়েক কাটিয়ে আসেন।

এবার নৈনিতালে এসেছেন।

হোটেলে থাকা তাঁর পছন্দ নয়। বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে থাকতে তিনি অভ্যস্ত নন। যেখানেই যান, হোটেলে না উঠে একটা বাড়ি ভাড়া করেন। এখানেও তাই করেছেন। সেকেণ্ড রেঞ্জের অর্কিড হাউস ভাড়া নিয়েছেন। ভাড়া একটু বেশী। তা হোক, বাড়িটা ভালো।

প্রথম কদিন সময় তাঁর ভালোই কেটেছিল। সস্ত্রীক এসেছেন।

দুজনে মিলে চুটিয়ে বেড়িয়েছেন এধার-ওধার। তারপর লালায়িত হয়ে পড়েছেন অনেক মানুষের সঙ্গ পাবার জন্য। তিনি মিশুক মানুষ ; কলকাতার বকুল বাগানের মৃগাঙ্ক ঘোষের বৈঠকখানার জমাটি মজলিসের কথা কে না জানে !

এখানেও লোকের অভাব নেই।

ইচ্ছে করলেই মজলিস বসাতে পারেন। কিন্তু বিরাট এক অসুবিধা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। হিন্দী একরকম জানেন না, কাজেই পাঞ্জাব বা উত্তর প্রদেশেব লোকের সঙ্গে আলাপ জমাতে পারছেন না। প্রচুর বাঙালী এসেছে এবার নৈনিতালে। সেখানেও সুবিধা করতে পারলেন না মৃগাঙ্ক। উঁচু মেজাজ ও উঁচু মহলের মানুষ তাঁরা। মৃগাঙ্ক ঘোষের প্রচুব পয়সা আছে, তাই তাঁরা পাত্তা দিলেন না।

পৃথিবীতে অসংখ্য শ্রেণীর মানুষ আছে।

মৃগাঙ্ক ঘোষ এক বিচিত্র শ্রেণীর সন্দেহ নেই। তিনি পথে পথে বাঙালি খুঁজে বেডাতে লাগলেন। অবশ্য মধ্যবিত্ত বাঙালি—যাদের সঙ্গে গল্পগুজোব করে আনন্দ পাবেন। সুকুমার ও মধুসূদনবাবুকে দেখতে পেয়ে তাঁর ধারণা হল, এঁদের সঙ্গে আলাপ করতে চাইলে তিনি উপেক্ষিত হবেন না।

রাস্তার ধারের বেঞ্চের ওপর বসে ঘণ্টাখানেক গল্পগুজোব হল তিনজনের মধ্যে।

মৃগাঙ্ক ঘোষকে অপছন্দ হল না সুকুমারের। কথাবার্তা বেশ গুছিয়ে বলতে পারেন ভদ্রলোক, এবং রসিকও। মধুসূদন গুপ্ত কিভাবে গ্রহণ করলেন ভদ্রলোককে তাঁর মুখ দেখে বুঝতে পারা গেল না।

মৃগাঙ্ক ঘোষের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরে আসবার পর মধুসূদন গুপ্ত বললেন, কিরকম দেখলে লোকটিকে ?

মন্দ কি !

কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে ?

একটু চিন্তা করে সুকুমার বলল, কই না !

মধুসূদন গুপ্ত হাসলেন।

তুমি নিতান্তই ছেলেমানুষ।

বেশ তো, বলুন না, কি এমন বিশেষ জিনিস আপনি ভদ্রলোকের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন ?

একটু সতর্ক থাকলে তুমিও বুঝতে পারতে। তাঁর কথাবার্তার ধারা একটা বিশেষ দিক ঘেঁষে ছিল। সুতরাং আমার অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় নি, নারী জাতির ওপর অসম্ভব দুর্বলতা আছে তাঁর।

কথা শেষ করে মধুসূদন গুপ্ত এক টিপ নস্যি নিলেন।

মৃগাঙ্ক ঘোষ নিয়মিত সিলভার অ্যারো হোটেলে আসতে লাগলেন। তিনি আসেন বেলা পড়ে এলে, যান রাত জমে উঠলে। চা-পর্বটা এখানেই সমাধা করেন। নানা প্রসঙ্গ নিয়ে গল্প হয়।

তবে সুকুমার লক্ষ্য করেছে, প্রসঙ্গ যাই হোক না কেন, একটি নারী চরিত্রকে কোন না কোন উপায়ে ঠিক এনে ফেলেন মৃগাঙ্ক। তখন তাঁর মুখ-চোখ বেশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মধুসূদন গুপ্তের সন্দেহ সম্পর্কে সে নিশ্চিত হল।

সন্ধ্যা সাতটার কিছু পরে মৃগাঙ্ক উঠলেন। পোর্টিকো পর্যন্ত তাঁকে পৌঁছে দিয়ে এলো সুকুমার।

আবার ওপরে উঠে যাবার মুখে দিলীপ মুখার্জি বললেন, একটা কথা বলছিলাম…

কাউন্টারে তখন আর কেউ ছিল না।

সিঁড়ির মুখ থেকে সরে এসে কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল সুকুমার।

বলুন।

মিক্সচারের সাহায্যে সিগারেট পাকাচ্ছিলেন দিলীপ মুখার্জি। ধরিয়ে নিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, একটা প্রশ্ন ছিল, যদিও অনধিকার চর্চা…

সঙ্কোচ করবেন না। কি বলতে চান বলুন না!

যাঁকে আপনি পোর্টিকো পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলেন, ওঁর নাম যতদূর মনে পড়ছে মৃগাঙ্ক ঘোষ। ওঁকে কতদিন থেকে চেনেন ?

দিন ছয়েক, কেন বলুন তো ?

ভদ্রলোক বিশেষ সুবিধের নয়।

ওঁকে চেনেন ?

নাম বললাম শুনলেন না! একবার সিলভার অ্যারোতে এসে উঠেছিলেন, তখন থেকেই আমি ওঁকে চিনি।

সুবিধের নয় বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন ?

সে অনেক ব্যাপার, সমস্ত কথা বলতে চাই না। আপনি আমার একজন বোর্ডার এবং আপনাকে আমি একজন সজ্জন ব্যক্তি বলে মনে করি, সুতরাং সাবধান করে দেওয়া কর্তব্য বলে মনে করলাম।

বিস্মিত সুকুমার বলল, এই হোটেলেই এমন কিছু করেছিলেন কি যা মোটেই ভব্যতাসুলভ নয় ?

বার কয়েক সিগারেটে ঘন ঘন টান দিয়ে, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মুখার্জি বললেন, ঠিক তাই। সেদিন হোটেলের সুনাম যে কিভাবে রক্ষা পেয়েছিল, তা একমাত্র আমিই জানি। আমি কল্পনাও করতে পারি নি, ভদ্রলোক আবার সিলভার অ্যারোর দরজা অতিক্রম করে ভিতরে আসবেন। আপনার সময় আর নষ্ট করতে চাই না। ভালো কথা, বয় কি রাত্রের খাবার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসবে ?

না, আমরা ডাইনিং রুমে আসব।

চিন্তিত সুকুমার ওপরে চলে গেল।

সুকুমার ওপরে চলে যাবার পর দিলীপ মুখার্জি গৌড়কে আহ্বান করলেন। রাজেন্দ্র গৌড়, তাঁর সহকারী। চটপটে ছোকরা। মুখার্জি তাকে লক্ষ্ণৌ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। কাজের ছেলে। বিশ্বাসীও! তাকে কাউন্টারে থাকতে বলে মুখার্জি হোটেল থেকে বেরুলেন।

ভদ্রলোক বিশেষ লম্বা নয়, আবার তাঁকে বেঁটেও বলা চলে না। মাঝামাঝি। স্মার্ট। গায়ের রঙ কালো। রঙ কালো হলেও মুখশ্রী ভালো। চোখে উগ্র আধুনিক প্যাটার্নের চশমা।

হোটেলের বাইরে এসে, অলেস্টারের কলার ভালো করে তুলে দিয়ে তিনি অগ্রসর হলেন। এপ্রিল শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু ঠাণ্ডার

বহর দেখে কে বলবে ভারতের অন্যান্য প্রান্তে এখন বিরক্তিকর গরম চলেছে! শ'খানেক গজ এগোবার পর একটা বাড়ির সামনে থামলেন দিলীপ মুখার্জি।

ইংল্যাণ্ডের কাউন্টিতে যে ধরনের বাড়ি তৈরি হয়, এই বাড়িখানার চেহারা হুবহু সেরকম। অনেকখানি জমি ঘিরে বাউণ্ডারি-ওয়াল। গেটের পাশে পাথরের ফলকের ওপর লেখা রয়েছে 'আড্ডাবাড়ি হাউস'।

নাম পড়ে অনেকের মনে স্বাভাবিক ভাবে উদয় হতে পারে, পথিকের মনে হাস্যরসের উদ্রেক করার জন্য গৃহকর্তা এই নাম রেখেছেন! কিম্বা এখানে ক্লাব আছে—রসিক সভ্যরা ক্লাবের নামকরণ করেছেন 'আড্ডাবাড়ি হাউস'। প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু তা নয়।

বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বিহারের পূর্ণিয়া শহরে থাকেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা ভালো। শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে তাঁর অনেক জমিজমা আছে, আর আছে বিঘা তিরিশেক বিস্তৃত এক আমবাগান। ওই অঞ্চলের লোক ওই আমবাগানকে আড্ডাবাড়ি নামে উল্লেখ করে থাকে।

জানা যায় না প্রথমে কে বীরেন বিশ্বাসের নাম 'কুমারবাহাদুর অব আড্ডাবাড়ি' দিয়েছিল। তবে একথা নিশ্চিত, কেউ একজন এই নামকরণ করেছিল। এই উপাধিতে খুশি হয়েছিলেন বীরেন; মনে-প্রাণে চেয়েছিলেন, লোকে যেন তাঁর নামের সঙ্গে ওই উপাধিটা যুক্ত করে উচ্চারণ করে। মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে, সকলে এখন তাঁকে আড্ডাবাড়ির কুমারবাহাদুর নামেই উল্লেখ করে।

নৈনিতালে বেড়াতে এসেছিলেন একবার কুমারবাহাদুর।

সস্তায় একটা বাড়ি বিক্রি হচ্ছে শুনে কিনে ফেললেন। 'আড্ডা-বাড়ি হাউস' লিখিয়ে পাথরের ফলক গেটের সঙ্গে যুক্ত করা হল। প্রতি বছরই এসে মাস দুয়েক থেকে যাচ্ছেন। তিনি বিবাহিত ও সন্তানের জনক হওয়া সত্ত্বেও কাউকে সঙ্গে করে এখানে আনেন না—আসেন সম্পূর্ণ একা।

দিলীপ মুখার্জির সঙ্গে বছর তিনেক আগে হঠাৎ আলাপ হয়ে

গিয়েছিল আড্ডাবাড়ির কুমারবাহাদুরের। তিনি তারপর থেকে নৈনিতালে এলেই মুখার্জি মাঝে মাঝে যান তাঁর কাছে। গল্পগুজোব হয়; গল্পের ফাঁকে ফাঁকে কিছু লালজলও যে দুজনের পেটে না যায় তা নয়।

গেট পেবিয়ে সুরকি-ঢালা পথ মাড়িয়ে পার্লারে পৌছলেন দিলীপ। সেখানে কেউ নেই। কুমারবাহাদুরের সন্ধান পাওয়া গেল ড্রইংরুমে। তিনি রেডিও শুনছিলেন। ঘরের স্তিমিত আলোয় ভালো করে তাঁকে দেখা যাচ্ছিল না। দিলীপ মুখার্জিকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে তিনি দ্রুত খনখনে গলায় বললেন, আসুন, আসুন, আপনার কথাই ভাবছিলাম—

নব ঘুরিয়ে রেডিও বন্ধ করে বড় আলো জ্বাললেন তিনি।

তাঁকে বেঁটেই বলা চলে। গায়ের রঙ মিশমিশে কালো, ভাঙা চোয়াল, দীপ্তিহীন মুখ, অসম্ভব রোগা।

গায়ে তাঁর ঢলঢলে ড্রেসিং গাউন। অত্যন্ত বেমানান দেখাচ্ছে। ডান হাতের দু আঙুলের ফাঁকে কটু গন্ধযুক্ত জ্বলন্ত সিগারেট। এক অপরূপ চেহারার অধিকারী কুমারবাহাদুর অব আড্ডাবাড়ি। একবার দেখলে সহজে কেউ তাঁকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে না।

দিলীপ বসলেন একটা সোফায়।

খনখনে গলায় কুমারবাহাদুর আবার বললেন, দিন দুয়েক এলেন না তো! ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন বুঝি?

সিজিন টাইম চলেছে, সময় হাতে খুব অল্প পাই।

আসবেন, আসবেন, সময় হাতে পেলেই চলে আসবেন। বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে। নৈনিতালে আপনি ছাড়া তো আমার আর কোন পরিচিত লোক নেই!

পকেট থেকে পাউচ বার করে মুখার্জি বললেন, একা আসেন কেন? স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে আর নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয় না।

স্ত্রী!

দীর্ঘ লয়ে হাসলেন কুমারবাহাদুর।

বিরাট ড্রইংরুম যেন ঝনঝন করে উঠল। আগে দিলীপ মুখার্জির মনে হত এই শব্দে বুঝি জানলার কাঁচগুলো সব ফেটে গেল। মাথার মধ্যেটা যেন কেমন করে উঠত। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে।

শাস্ত্রকাররা ঠিকই বলেছিলেন ম্যানেজার সাহেব, পথে নারী বিবর্জিতা! ঘরে আছে, বেশ আছে; তাকে পথে টেনে নিজের জীবনকে কেন বিড়ম্বিত করে তুলি বলুন?

কিন্তু…

কিন্তু শব্দটাকে তালাক দিন। আমার কথা চিন্তা করে দেখবার চেষ্টা করুন। মেয়েমানুষ আর স্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য অনেক। স্ত্রীকে আপনি নারী সংজ্ঞা দিতে পারেন। মেয়েমানুষ—পথে তাকে কিন্তু বিবর্জন করা চলবে না। নইলে ফুর্তির বান মনে ডাকবে কিভাবে?

কুমারবাহাদুরের কথায় দিলীপ মুখার্জি অবাক হলেন। পূর্বে তিনি এ ধরনের কথা তাঁকে বলতে শোনেন নি কখনও। তাই একটু ইতস্তত করে বললেন, চাকররা ছাড়া বাড়িতে আর কেউ আছে নাকি?

আবার হাসলেন কুমারবাহাদুর। সমস্ত ঘরখানাকে চৌচির করে হাসলেন যেন। তারপর বললেন, না, না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। একটা উপমা দিলাম মাত্র। বাড়িতে আমি একাই আছি। যাক ওকথা, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। আসুন, ভিজিয়ে নেওয়া যাক।

তিনি উঠে গিয়ে হোয়াটনটের ওপর থেকে হুইস্কির বোতল ও সোডা নিয়ে এলেন। সিল করা বোতলের মুখ ভাঙতে যাবেন—

মুখার্জি বললেন, ভাঙবেন না, থাক। আমি সঙ্গে করে একটা বোতল নিয়ে এসেছি, ট্রাই করে দেখুন।

তিনি অলেস্টারের পকেট থেকে একটা বোতল বার করলেন।

ভ্যাট সিক্সটি নাইন। তোফা জিনিস। কোথা থেকে পেলেন?

আমি হোটেলের ব্যবসা করি, এ সমস্ত মাল না রাখলে কি চলে?

গেলাসে ঢালা যাক, কি বলেন ?

নিশ্চয়ই।

দুটো গেলাসে বোতল থেকে তরল নেশা ঢেলে মুখার্জি বললেন, গেলাস তুলে নিন। আমরা এবার কারুর স্বাস্থ্য পান করি।

কুমারবাহাদুর গেলাস তুলে নিলেন।

আমরা রক্তিমার স্বাস্থ্য পান করব।

রক্তিমা !!

একটি মেয়ে। এই মুহূর্তে তার স্বাস্থ্য পান করা আমি যুক্তিসঙ্গত মনে করছি।

গেলাসে গেলাস ঠেকালেন দুজনে। মৃদু মিষ্টি শব্দ হল। গেলাসের মধ্যে চলকে উঠল ভ্যাট সিক্সটি নাইন। দুজনে রক্তিমার স্বাস্থ্য পান করলেন।

এরপর বোতল খালি হতে সময় বেশি লাগল না।

ঢুলু ঢুলু চোখে সোফার ওপর এলিয়ে পড়লেন দুজনে। কুমারবাহাদুর অসংলগ্ন কথার বন্যা বইয়ে দিলেন। দিলীপ মুখার্জি যে কিছু অসংযত হয়ে পড়লেন না তা নয়। আরও বোতল দেড়েক হুইস্কি গলায় ঢেলে দেবার পর তিনি কিভাবে হোটেলে ফিরে এসেছিলেন, তা তাঁর জানা নেই।

মৃগাঙ্ক ঘোষ সম্পর্কে যে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন দিলীপ মুখার্জি, সেকথা সুকুমার বলে নি মধুসূদন গুপ্তকে। সে সতর্ক হয়ে আছে। দেখাই যাক না ভদ্রলোককে শেষ পর্যন্ত।

প্রতিদিন বিকেল পাঁচটার মধ্যে মৃগাঙ্ক চলে আসেন সিলভার অ্যারোতে। আজ ছটা বেজে গেল, তাঁর দেখা নেই!

সওয়া ছটার সময় মধুসূদন গুপ্ত বললেন, কি ব্যাপার হে কুটু? ঘোষ মশাইয়ের তো দেখা নেই!

তাই তো দেখছি, ভদ্রলোক বোধ হয় আজ আর এলেন না।

তিনি তো এলেন না—এদিকে যে আমাদের বিকেলটা মাটি

হয়ে গেল। এখন কোথাও বেরোন কি ঠিক হবে?

বাইরে যাওয়া অবশ্য ঠিক হবে না। চলুন, পার্লারে গিয়ে বসি।

পার্লারে গিয়ে বসতে হল না, মৃগাঙ্ক ঘোষ ঘরে প্রবেশ করলেন।

আজ এত দেরি করে ফেললেন?

মৃগাঙ্ক চেয়ারে বসে বললেন, বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম ঠিক সময়, পথে দেরি হয়ে গেল।

এক টিপ নস্যি নিয়ে মধুসূদন গুপ্ত বললেন, পথে দেরি হয়ে গেল অর্থে কোথাও আটকে পড়েছিলেন?

বীভৎস এক দৃশ্য দেখতে গিয়ে দেরি করলাম বলতে পারেন।

দুজনেই হতবাক।

বীভৎস দৃশ্য!

বীভৎস না বলে তাকে হৃদয়বিদারক বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়। ফারদৌখি হোটেলটা দেখেছেন তো? এখান থেকে আধ মাইলটাক দূরে হবে বোধ হয়। বাড়ি থেকে বেবিয়ে ফারদৌখির পাশ দিয়েই আমি আসছিলাম। লক্ষ্য করলাম, হোটেলের মধ্যে প্রচুর সোরগোল চলেছে। ছুটোছুটিও কম হচ্ছে না। তাছাড়া গেটের গোড়ায় পুলিশ-ভ্যান দাঁড়িয়ে রয়েছে। ব্যাপার কি? কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আরও বহুলোক দাঁড়িয়েছিল। ক্রমে শুনলাম, একটি মেয়ে নাকি খুন হয়ে গেছে। কে তাকে খুন করেছে বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

সুকুমার বলল, বলেন কি!

শুনুন, তারপর কি হল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর, পুলিশ স্ট্রেচারে করে মৃতদেহ বয়ে এনে গাড়িতে রাখল। গাড়িতে তোলবার সময় পরিষ্কার দেখতে পেলাম। বয়স খুব বেশি নয়। গায়ের রঙ ফরসা। দেখতে-শুনতে বোধ হয় ভালোই ছিল, এখন বোঝবার উপায় নেই। ভারি কোন কিছু দিয়ে মুখ একেবারে থেঁৎলে দেওয়া হয়েছে। চটচটে রক্ত তখনও গড়িয়ে পড়ছে। কে যে মেয়েটিকে এইভাবে মারল ভগবান জানেন।

মধুসূদন গুপ্ত বললেন, মেয়েদের তো খুন হবার কথা নয়, খুন হবে পুরুষ মানুষ—এই তো নিয়ম!

মৃগাঙ্ক সিগারেট ধরালেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

এ আমার একটা থিওরি। সকলকে আমার থিওরি মানতে হবে, এমন কোন কথা নেই। আমার দৃঢ় ধারণা হল, মেয়েরা রক্তপাত ঘটাবার জন্যই পৃথিবীতে আসে।

আপনি তো দুর্বোধ্য হয়ে উঠলেন মশাই।

দুর্বোধ্য কোথায়! উদাহরণ দিয়ে বলছি। ইতিহাসকে খুঁটিয়ে দেখুন, বিখ্যাত যুদ্ধগুলোর আরম্ভ হওয়ার মূলে কোন নারীর হাত আছে, বা কোন নারীকে উপলক্ষ্য করেই যুদ্ধ। এখনও হয়তো ওই একই ব্যাপার। কোন মেয়ের প্ররোচনায় কোন পুরুষ এই মেয়েটিকে খুন করেছে।

সুকুমার এইভাবে মধুসূদন গুপ্তকে কথা বলতে কোনদিন দেখে নি, অবাক হয়ে যাওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক। সে বিস্মিত গলায় বলল, আপনি যা বললেন, তাতে হয়তো সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে আমার ধারণা হচ্ছে, মেয়েদের প্রতি আপনি যেন বিদ্বেষভাব পোষণ করেন।

মধুসূদন গুপ্ত মৃদু হাসলেন।

মৃগাঙ্ক বললেন, যত অন্যায় কাজ করুক না কেন, তবু মেয়েদের নিষ্ঠুরভাবে খুন করা হোক, এতে আমার ঘোর আপত্তি আছে।

ওদের সম্পর্কে আপনি অত্যন্ত দুর্বল মনে হচ্ছে মিস্টার ঘোষ।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই। দেখুন মিস্টার গুপ্ত, সতীসাধ্বী ইত্যাদি বিকারগুলোকে আমি মোটেই আমল দিই না। আমি ওদের অত্যন্ত লোভনীয় খাদ্যবস্তু বলে মনে করি। সুতরাং ওই লোভনীয় খাদ্যবস্তু অযথা নষ্ট হোক, তা আমি পছন্দ করি না। মিস্টার রায়, আপনার অভিমত কি?

আমার···মানে···, সুকুমার ইতস্তত করতে লাগল।

ইতস্তত করছেন কেন? উই আর অল ফ্রেণ্ড হিয়ার। বলুন—

বলুন? মন খুলে কথা বলুন।

দেখুন, আমি মেয়েদের সঙ্গে বিশেষ মিশি নি। ছেলেমানুষী মনে করবেন না, আগে মনে হত ওরা এক গেলাস পাইন-অ্যাপেলের যুস। তারিয়ে তারিয়ে গেলাস শেষ করে দিলে মন ভরে উঠবে। কিন্তু একবার বিশেষ এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল। তারপর থেকেই আমার ধারণা হয়েছে, পাইন-অ্যাপেলের যুস-ভর্তি সমস্ত গেলাস উপাদেয় না হওয়াই হল বাস্তব।

অর্থাৎ আপনি কারুর প্রেমে পড়েছিলেন, এবং তাকে আকণ্ঠ পান করতে গিয়ে তেমন মিষ্টি আস্বাদন পেলেন না। মিস্টার গুপ্ত—

বলুন?

ওদের সম্পর্কে আপনার মত এত তিক্ত কেন, বুঝিয়ে বলুন না?

মধুসূদন গুপ্ত কেমন বিপন্ন বোধ করলেন, কি করবেন শুনে, ও-কথা থাক মিস্টার ঘোষ।

থাকবে কেন? লজ্জা আমাদের ভূষণ নয়; বলুন, শুনি।

আপনি বরং বলুন। নিজের স্ত্রীর মধ্যে কি এমন পেলেন, যার জন্য সমস্ত জাতটার ওপর আপনার এমন গদগদ ভাব?

আকাশ থেকে পড়লেন মৃগাঙ্ক ঘোষ। সিগারেটের টুকরোটা অ্যাস্ট্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বললেন, আমার স্ত্রী আবার পেলেন কোথা থেকে?

সস্ত্রীক এখানে এসেছেন, এই তো শুনেছিলাম।

একটু ভুল শুনেছেন। একজন মহিলা আমার সঙ্গে আছেন বটে, তবে তিনি আমার স্ত্রী নন। ফুলে ফুলে মধু খেয়েই তো বেড়াচ্ছি, বিয়ে করবার সময় পেলাম কোথায়।

মধুসূদন ও সুকুমার দুজনেই হতভম্ব।

আপনারা আশ্চর্য হয়ে গেছেন মনে হচ্ছে।

তা হয়েছি বৈকি। মধুসূদন বললেন, তার মানে ওই মহিলাটি···

স্বাভাবিক গলায় মৃগাঙ্ক বললেন, সেকেলে ভাষায় রক্ষিতা বলতে পারেন। ইনি বছর খানেক ধরে আছেন আমার কাছে। মন ভরে

গেলেই বিদায় দেব। আবার একটি সংগ্রহ করে নিতে হবে।

সুকুমার বলল, বলেন কি মিস্টার ঘোষ?

জটিল কিছু তো বলি নি! আমার বৈশিষ্ট্য বললাম। বুঝতে পারছি, আমার সম্পর্কে আপনাদের মনোভাব কয়েক ধাপ নেমে গেল। কি করব বলুন, নিজের চরিত্রকে ঢাকতে গিয়ে মিথ্যে কথা তো বলতে পারি না।

আপনার জীবনে তাহলে অসংখ্য মেয়ে এসেছে?

অসংখ্য। জাতিধর্মনির্বিশেষে। আপনার ভাষায় বলি, তাদের আমি পাইন-অ্যাপেলের যুসের মত তারিয়ে তারিয়ে খেয়েছি। অবশ্য এই ব্যাপারে আমার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছে।

মধুসূদন বললেন, রুচির প্রকার ভেদ আছেই। আপনার যা ভালো লাগবে, আমার যে তা ভালো লাগতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবু বলব, আপনার বৈচিত্র্যপূর্ণ-জীবন অনেকের কাছে লোভনীয় হবে। আপনি কিন্তু এক কাজ করলে ভালো করতেন।

কি কাজ?

জীবনে অনেক মেয়ে এসেছে, অনেক কাহিনী গড়ে উঠেছে। সেগুলি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করলে লোকে উপভোগ্য কাহিনী পড়বার সুযোগ পেত। আপনিও নাম-করা সাহিত্যিক হয়ে যেতেন।

সাজিয়ে-গুজিয়ে লেখা সোজা কথা নাকি? ও-সব আমার আসে না মশাই, তবে গুছিয়ে বলতে পারি।

উৎসাহের সঙ্গে সুকুমার বলল, বেশ তো, তাই বলুন শুনি।

আবার সিগারেট ধরালেন মৃগাঙ্ক ঘোষ।

আপত্তি নেই। তবে তার আগে আপনাদের দুজনের অভিজ্ঞতার কথা আমি শুনতে চাই।

আমার অভিজ্ঞতা·· আমি তো আপনার কাছে শিশু।

আমি ভুলি নি মিস্টার রায়, পাইন-অ্যাপেলের যুসের সমস্ত গেলাস আপনার সুস্বাদু মনে হয় নি—সে অভিজ্ঞতার কথা সহজেই বলতে পারেন। মিস্টার গুপ্ত শোনান, আমার অনুমান করে নেওয়া

তাঁর জীবনের কোন হত্যাকারী নারীর কথা, তারপর আমি নিজের কথা বলব।

সুকুমার না-না করেও রাজি হয়ে গেল। তবে তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল, মিস্টার গুপ্ত সম্মত হবেন না। কিন্তু কি আশ্চর্য, তিনি কোন আপত্তির কথা তুললেন না, এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন—যেন বলতে পারার সুযোগ পেয়ে তিনি আনন্দিত।

তিনজনে ঘনীভূত হয়ে বসলেন। এক বিচিত্র আসর আরম্ভ হবে এবার।

স্থির হল সুকুমার প্রথমে বলবে। তারপর বলবেন মধুসূদন গুপ্ত। সবশেষে মৃগাঙ্ক।

নিজের গলাটা ঝেড়ে নিয়ে সুকুমার আরম্ভ করল।…

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় কুট্টুর রেজাল্ট ভালোই হয়েছিল, বি-এ'তে কিন্তু আশানুরূপ ফল হল না। পাশ-কোর্সে কোন রকমে বেড়া ডিঙিয়ে গেল বলা চলে। বাড়ির সকলে চেয়েছিলেন, অনার্স নিয়ে সে বি-এ পাশ করুক, তারপর মাস্টার ডিগ্রীটা করায়ত্ব করে নিক।

কুট্টু বাড়ির লোকেদের ইচ্ছায় বাদ সাধল। কোন রকমে গ্র্যাজুয়েট হবার পর সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্ক আর রাখল না। সকলকে জানিয়ে দিল, পড়াশুনা অনেক হল, আর নয়। এবার সে চাকরির সন্ধান করবে। চুপ-চাপ বসে থেকে স্রেফ দাদাদের অন্ন ধ্বংস করে যাওয়া অত্যন্ত লজ্জাজনক, এটুকু হৃদয়ঙ্গম করবার বয়স তার হয়েছে।

চাকরি চাইলেই পাওয়া যায় না—বিশেষ করে আজকের এই শোচনীয় চাকরি-সমস্যার যুগে। এখানে-ওখানে আবেদন করল, কেউ ডাকল, কেউ ডাকল না। যারা ডাকল, সেখানে ইণ্টারভিউ সুবিধার হল না—সুতরাং চাকরি হল না।

অনেকে পরামর্শ দিলেন, এখানে-ওখানে ছুটোছুটি করে লাভ নেই, তুমি জামালপুর ওয়ার্কসপে চেষ্টা করো। মাঝে মাঝেই প্রার্থীর

আবেদন হয়, চিন্তার কোন কারণ নেই। কুট্টু বিষয়টি অনুধাবন করে দেখল, মন্দ কি, দাদারা সকলে ওখানে কাজ করেন, সেও না হয় করবে।

মাস খানেক পরে সুযোগ এল। কয়েকটি পদের জন্য বেশ কিছু কর্মীর প্রয়োজন রেলকর্তৃপক্ষের। অনেকের সঙ্গে কুট্টুও আবেদন করল। ডাক এল যথা সময়ে। ডাক পাওয়ার পরই তার মন নিশ্চিন্ততায় ভরে গেল। কেমন মনে হতে লাগল চাকবি হয়ে যাবে।

উৎফুল্ল মনেই অনেক দিন পরে কুট্টু গঙ্গার ধারে বিকেলে বেড়াতে গেল। সূর্য তখনও ডোবে নি, তবে ডুবতে বিশেষ বিলম্ব নেই। সুদৃশ্য লোহার বেড়ায ঘেরা উঁচু কষ্টহারিণী ঘাটের পাড়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখতে চমৎকার লাগে। কলেজ জীবনে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে কুট্টু এখানে নিয়মিত এসেছে। বসে থেকেছে কয়েক ঘণ্টা—সিগারেট ফুঁকেছে।

বলতে বাধা নেই, মুঙ্গেরের বেশির ভাগ ছেলের সিগারেটে হাতে-খড়ি হয় এখানে। বয়স্ক লোকের আনাগোনা কম—হয়তো বয়স্করা ছোকরাদের কাছ থেকে নিজেদের মান বাঁচানোর জন্যই এখানে আসেন না, সুতরাং বেপরোয়াভাবে ধোঁয়ার কারিকুরি করতে বাধা নেই।

সুবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব মীরকাশিম স্বপ্নেও নিশ্চয় ভাবতে পারেন নি, গঙ্গার দিক থেকে আগত শত্রুকে বাধা দেবার তাঁর এই বিশেষ ঘাঁটি একদিন তরলমতি তরুণদের খেয়ালখুশির জায়গা হয়ে উঠবে।

একটা বেঞ্চের ওপর বসে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কুট্টু দেখছিল, টকটকে লাল সূর্য যেন গঙ্গার জল স্পর্শ করেছে। এবার অথৈ জলে তলিয়ে যাবে। বাস্তবে এরকম ঘটে না। তবু এরকম মনে হয় কেন? সূর্য তলিয়ে চলেছে—একমনে দেখছে কুট্টু।

হঠাৎ তার চমক ভাঙল। খুব কাছেই কারা যেন বাংলায় কথা বলল।

মুখ তুলে দেখল, হাত কয়েক দূরে একদল দাঁড়িয়ে। দলে মেয়ের সংখ্যাই বেশি। পুরুষ মাত্র দুজন। অপরিচিত। হয় এরা বাইরে থেকে মুঙ্গেরে এসেছে কারুর বাড়িতে বেড়াতে, কিম্বা জামালপুরের। কুট্টু দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে আবার অস্তগামী সূর্যকে দেখতে লাগল।

কিহে সুকুমার, তুমি এখানে বসে?

আবার চমকাবার পালা।

মুখ ফিরিয়ে দেখল, অনন্তবাবু। অনন্ত মুখার্জি—ওদের পারিবারিক বন্ধু। সজ্জন প্রকৃতির। জামালপুর রেলওয়ে ওয়ার্কসপে কাজ করেন—থাকেন ওখানকার ইস্ট কলোনীর কুইন্স রোডে।

তিনি বললেন, চুপ করে বসে আছো এখানে?

উঠে দাঁড়িয়ে কুট্টু বলল, কিছু করবার নেই, বসে বসে স্রেফ সময় কাটাচ্ছি। আপনি নিশ্চয় বেড়াতে এসেছেন?

মেয়ে-পুরুষের দলটির দিকে আঙুল নির্দেশ করে অনন্ত বললেন, এঁরা সব এসেছেন কলকাতা থেকে। আমার স্ত্রীর বাপের বাড়ির লোক। মুঙ্গের ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি সকলকে।

এঁদের মধ্যে বৌদিকে তো দেখছি না?

ও আসে নি। কলিক-পেন চাগাড় দেওয়ায় বাড়িতে রয়ে গেল।

অনেক কথা হল দুজনের মধ্যে। অন্যান্যরা হাঁ করে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কলকাতার লোক তাঁরা। ফ্রেমে-আঁটা ভাগীরথীকে দেখতে অভ্যস্ত, এখানকার গঙ্গার বিস্তৃতরূপ স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের হতবাক করে দিয়েছে।

এক সময় অনন্তবাবু বললেন, ভালোই হল তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে, আমার একটা সমস্যার সমাধান তুমি নিশ্চয় করতে পারবে।

বলুন?

রেবু এবার ক্লাশ সেভেনে উঠল। পড়ার চাপ তার বেড়েছে স্বীকার করতেই হবে। অথচ ভালো একজন প্রাইভেট টিউটার পাচ্ছি না। তুমি একটু ওকে দেখিয়ে দাও না।

অবাক হয়ে কুট্টু বলল, আমি…!

অবাক হচ্ছ কেন! তোমার হাতে সময় রয়েছে। রেবু তোমাকে চেনে, তোমার কাছে পড়তে আপত্তি করবে না।

সমস্ত মেনে নিলাম। কিন্তু আপনি কিভাবে নিশ্চিন্ত হচ্ছেন, আমি একজন ভালো শিক্ষক হিসেবে নিজের কর্তব্য পালন করতে পারব?

অনন্তবাবু মৃদু হেসে বললেন, আজকালকার ছেলেদের আরগুমেন্টের ঠেলায় চোখে অন্ধকার দেখতে হয়। আমি তোমাকে উপযুক্ত লোক বিবেচনা করেই অনুরোধ করছি।

বেশ, পড়িয়ে দেব রেবুকে। কোন সময় যেতে হবে বলুন?

বিকেলের ট্রেনে এস। পড়িয়ে বাসে ফিরে যেতে পারবে।

মুঙ্গের থেকে জামালপুরের দূরত্ব ন' কিলোমিটার।

আরেকটা কথা, টিউশন ফি তোমাকে প্রতি মাসে নিতে হবে।

এ-কথা বলবেন না অনন্তদা, রেবু আমার ভাইঝি, টিউশন ফি নিয়ে তাকে পড়াতে যাব কেন?

নেবে না কি রকম? বেকার বসে আছো, পয়সা-কড়ির তো দরকার হয় হে? বড় ভাইয়ের কাছ থেকে না হয় সামান্য কিছু হাত-খরচ নিলে।

কুট্টু আর কিছু বলতে পারে না।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে অনন্ত আবার বললেন, তাহলে কথা পাকা হয়ে গেল। আজ ছাব্বিশ তারিখ, মাস পুরে গেলেই তুমি রেবুকে পড়াতে আসবে।

নির্দিষ্ট দিনে বিকেলের ট্রেনে কুট্টু জামালপুরে গেল। ব্রীজ পার হয়ে কুইন্স রোডে পৌঁছতে তার মিনিট দশেকের বেশি সময় লাগল না। অনন্ত মুখার্জির কোয়ার্টারের গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতে যাবে, লক্ষ্য করল, বছর আঠারো-উনিশের একটি মেয়ে বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে কোন পত্রিকার পাতা উল্টোচ্ছে।

কেউ হবে।

কুট্টু তাকে ভ্রূক্ষেপ না করে বারান্দা পেরিয়ে ঘরে ঢুকতে যাবে, মেয়েটি মুখ তুলে বলল, শুনুন।

সে মুখ ফেরাল।

ওঁরা কেউ বাড়িতে নেই।

নেই! ওঁরা তো জানতেন, আমি আজ আসব।

মেয়েটি থেমে থেমে বলল, জানতেন। কেণ্ট রোডে সকলে গেছেন বিশেষ প্রয়োজনে। বলে গেছেন, আপনি এলে যেন অপেক্ষা করেন।

কুট্টু কিছু না বলে আরেকখানা চেয়ারে বসল। ভাবতে লাগল, মেয়েটি কে হতে পারে। অনন্তদার পরিবারের কেউ হলে নিশ্চয় অপরিচিতা বলে মনে হত না, পাশের কোয়ার্টারের বোধ হয়।

মেয়েটি আবার পত্রিকার পাতা উল্টোচ্ছে। কুট্টু আড়চোখে তার দিকে তাকাল। বেশ দেখতে বললে কিছুই বলা হবে না, অপূর্ব দেখতে। চার বছর কো-এডুকেশন কলেজে পড়েছে। প্রচুর মেয়ে ছিল ক্লাশে। কিন্তু এই মুহূর্তে যাকে দেখল, এক পলকের জন্য হলেও সে দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারে, এ-রকম একটিও ছিল না।

মিনিট পাঁচেক কেটে গেল। কুট্টুর মন উতলা হয়ে উঠল। তার অবাধ্য চোখ ব্যগ্র হয়ে উঠল আরেকবার অদূরবর্তিনীকে দেখবার জন্য। অসীম বলে নিজেকে সংযত করল সে, তাকিয়ে রইল অন্যধারে।

আপনি মুঙ্গেরে থাকেন বুঝি?

অবিশ্বাস্যভাবে ওধার থেকে প্রশ্ন ভেসে এল।

কুট্টু মুখ ফিরিয়ে দেখল, মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে আছে।

হ্যাঁ।

আপনাকে দেখেছিলাম যেন সেদিন।

বিস্ময়ের পর বিস্ময়।

কোন্ দিন বলুন তো?

আমরা আপনাদের কষ্টহারিণীর ঘাট দেখতে গিয়েছিলাম, আপনি সে-সময় তো ওখানে বসেছিলেন।

সেদিন এ-মেয়েটিও ছিল নাকি! নিশ্চয় ছিল, নইলে তার কথা বলছে কিভাবে। আশ্চর্য, সে কিন্তু ওকে দেখতে পায় নি। •

হ্যাঁ; আমি ছিলাম। কেমন লাগল মুঙ্গের?

ভালো। গঙ্গার তুলনা হয় না। কলকাতায় এ-রকম জোয়ার-ভাঁটাহীন গঙ্গা থাকলে আমি প্রত্যহ সাঁতরাতাম।

কুটু্ একটু হাসল।

খুব ভালো সাঁতার না জানলে আমাদের গঙ্গায় সাঁতার কাটা রিস্কি। একটু ঢালু অবস্থায় বইছে। তাছাড়া, পাহাড়ের খোঁচাও আছে এখানে-ওখানে। আমাদের শহরে বেশির ভাগ লোকই সাঁতার জানে না, আমিও না।

মেয়েটি আর কিছু বলল না, পত্রিকার পাতায় মন দিল।

কুটু্ ভাবতে লাগল, এ-রকম সপ্রতিভ মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। অবশ্য ঘনিষ্ঠভাবে সে ক'টা মেয়েকেই বা দেখেছে। চুপচাপ কেটে গেল মিনিট পনেরো আরো। কি বিচিত্র পরিস্থিতি, একটি সুন্দরী অপরিচিত মেয়ে তিন হাত দূরে বসে আছে—পড়ছে। আর সে অপেক্ষা করছে আরেকজনের জন্য।

ধৈর্য পরীক্ষা শেষ হল, রেবুকে নিয়ে সস্ত্রীক অনন্তবাবু ফিরে এলেন। লজ্জিত গলায় বললেন, সরি সুকুমার, না গিয়ে উপায় ছিল না।

কোথায় গিয়েছিলেন?

আমার এক কলিগ সপে অ্যাক্সিডেণ্ট ঘটিয়ে বসেছে, তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। খুব বেশিক্ষণ বোধ হয় তোমাকে অপেক্ষা করতে হয় নি।

আধ ঘণ্টাটাক এসেছি। বৌদি, আপনার খবর বলুন?

মৃদু হেসে বৌদি বললেন, নতুন খবর তো কিছু নেই ভাই, পুরানোর জের টেনে চলেছি। কলিক-পেনই আমাকে শেষ করে দিল।

আপনার রোগ সারানো এখানকার ডাক্তারের কর্ম নয়। অনন্তদা, বৌদিকে ট্রপিক্যাল মেডিসিনে নিয়ে যান।

আমিও তাই স্থির করেছি; সামনের শীতে নিয়ে যাব। ভালো কথা,—অনন্তবাবু মেয়েটির দিকে আঙুল নির্দেশ করে বললেন, একে বোধ হয় চিনতে পারো নি?

কুট্টু মাথা নাড়ল।

ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বড় মিষ্টি—শ্যালিকা হে। কলকাতা থেকে অনেকে বেড়াতে এসেছিলেন—গঙ্গার ঘাটে দেখেছ তো? রত্না এসেছিল ওদের সঙ্গে। আমি মাস কয়েকের জন্য ওকে এখানে আটকে রাখলাম।

কুট্টু প্রসঙ্গান্তরে গেল, আমি ভাবছি, আজ থেকেই কাজ আরম্ভ করে দেব।

বেশ তো।

রেবু, চল, তোমার পড়ার জায়গায় যাই।

রেবুর মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারা যাচ্ছিল, পড়ার টেবিলের কাছে এখন যাবার ইচ্ছে তার নেই। অবশ্য কোন ওজোর-আপত্তি না তুলেই সে পড়তে গেল।

দিন কেটে চলেছে। নিয়মিতভাবে রেবুকে পড়াতে আসে কুট্টু। রত্নার সঙ্গে মাঝে মধ্যে দু-চারটে কথা হয়। অনন্তবাবুর মুখে শুনেছে, রত্না তাঁর মামাতো শালী। বেথুনে পড়েছিল বছর খানেক, পড়ায় মন না বসায় ছেড়ে দিয়েছে। এখন মাঝে মাঝে সখ করে থিয়েটার করে। এ-কথা শোনার পর কুট্টু বুঝতে পেরেছে, রত্না কেন এত সপ্রতিভ।

ইতিমধ্যে সে ইন্টারভিউ দিয়ে এসেছে।

একদিন অনন্তবাবু সকলকে নিয়ে ভীমবাঁধ গেলেন। ওখানকার লেক ও চারধারের দৃশ্য অনবদ্য। কুট্টুকেও যেতে হয়েছিল। এই প্রথমবার নয়, এই নিয়ে বার চারেক হল।

অনন্তবাবু রেলের একটা ভ্যান সংগ্রহ করেছিলেন, পথে কোন কষ্ট হয় নি। সমস্ত দুপুর কেটেছিল ওখানে চমৎকারভাবে। একলা

পায়ে পায়ে রত্না একসময় এগিয়ে গিয়েছিল অনেকটা।

কি খেয়াল হল, কুট্টু তাকে অনুসরণ করে বলল, একলা ওধারে যাবেন না।

মুখ ফিরিয়ে রত্না বলল, কেন বলুন তো ?

দেখছেন তো, জঙ্গল কি রকম দুর্ভেদ্য ? হয়তো ওখানে অনেক বিপদ অপেক্ষা করে রয়েছে।

বাঘ আছে নাকি ?

বাঘ তো আছেই। বাঘের চেয়েও হিংস্র জীব ওখানে থাকা অস্বাভাবিক নয়।

বাঘের চেয়েও হিংস্র! বলেন কি ? সেই জন্তুর নাম নিশ্চয় জানেন ?

জানি ; মানুষ।

শব্দ তুলে হাসল রত্না।

বেশ বললেন যা হোক, মানুষ কখনো বাঘের চেয়ে হিংস্র হতে পারে ?

পারে বৈকি। বাঘের হাত থেকে নিস্তার আছে, কিন্তু আপনার মত সুশ্রী মেয়ের পক্ষে কোন হিংস্র মানুষের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন।

রত্না আর এগুলো না।

সে-রকম অবস্থার সৃষ্টি হলে আপনি আমাকে রক্ষা করতে পারবেন না ?

রক্ষা করতে পারব কিনা বলতে পারি না, তবে রক্ষা করবার আপ্রাণ চেষ্টা করব, এটা ঠিক।

আপনি বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারেন।

আপনিই বা কম কিসে ?

দুজনের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

কেমন লাগছে ভীমবাঁধ ?

চমৎকার। শুধু ভীমবাঁধ কেন, আপনাদের মুঙ্গের জামালপুর

তুই আমার ভালো লেগেছে।

কুট্টু আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, এই ভালো লাগার জের আপনার মনে বেশিদিন থাকবে না। কলকাতায় ফিরে যাবেন—নিজের গণ্ডীর মধ্যে গিয়ে পড়লে এই সমস্ত কথা মন থেকে মুছে যাবে।

আপনার ধারণা ভুল, সহজে আমি কোন কথা ভুলি না।

আর কোন কথা হল না। দুজনে ফিরে এলো আর সকলের কাছে।

বুধবার দিনটা আর সকলের কাছে কেমন কুট্টু জানে না, তবে তার জীবনে এই দিনটি অনেক শুভ সংবাদ বয়ে এনেছে। ইণ্টারভিউ পাবার সংবাদ এসেছিল বুধবারে, আবার চাকরি পাবারও সংবাদ এলো ওই দিনটিতে।

যাক, এতদিন পরে কুট্টুর বেকার জীবনের ওপর যবনিকা পড়ল।

এখন সে চাকুরে। প্রতিদিন দাদাদের সঙ্গে আট ঘণ্টা করে কাজ করবে সপে গিয়ে। রেলে চড়তে আর পয়সা লাগবে না। ধোনুষকোটি থেকে পাঠানকোট পর্যন্ত যেখানে ইচ্ছে যেতে পারবে টিকিট না কাটিয়ে। অনেক দিনের একটা ইচ্ছাও পূর্ণ হবে।

কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে চলে যেতে পারবে নৈনিতাল।

অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ একটু তাড়াতাড়ি কুট্টু জামালপুর গেল। শুভ সংবাদটা অনন্তদাকে না জানানো পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছিল না। তাঁর কোয়ার্টারে পৌছে সে রত্না ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলো না।

রত্না হাসি মুখে বলল, রেবুদের স্কুলে আজ প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন। দিদি ও জামাইবাবু গেছেন ওখানে।

ও। আপনি গেলেন না?

স্কুলের ফাংশন দেখার অভিজ্ঞতা আমার আছে—কোন ব্যবস্থা থাকে না, ভিড়ের ঠেলা খেতে হয় শুধু। ও সমস্ত আমার ভালো লাগে না।

এখানে গেলে হয়তো নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করতেন, লক্ষ্য করতেন হয়তো সুব্যবস্থার চূড়ান্ত। ওঁরা কখন ফিরবেন ?.

আটটা বেজে যাবে।

মৃদু হেসে কুট্টু বলল, ছাত্রী অনুপস্থিত, সুতরাং আমারও কোন প্রয়োজন নেই এখানে। চলি।

রত্না কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল, যাবেন…

যাই, এখানে তো আর কিছু করবার রইল না।

অন্যত্র বিশেষ কোন কাজ না থাকলে বসুন না, একলা থাকতে কেমন ভয় ভয় করছে।

ভয়! ভয় কেন? এখানে তো কোন হিংস্র জন্তু নেই ?

হিংস্র মানুষ থাকতে পারে তো!

কুট্টু একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলল, কি হয়েছে বলুন তো ?

রত্না বসেই ছিল। আচলটা আলতো ভাবে মুখের ওপর বুলিয়ে নিয়ে বলল, দিদিকে বলেছিলাম, দিদি এ বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করবেন।

তার আগে আমায় বলতে আপনার আপত্তি আছে ?

রত্না ইতস্তত করে বলল, পাশের কোয়ার্টারের একটা ছেলে আমাকে ভীষণ বিরক্ত করছে! আমার ভয় হয একলা বাড়িতে থাকলে সে না এসে পড়ে! এখানকার সমস্ত আনন্দ সে আমার নষ্ট করে দিয়েছে।

সেকি…!

কুট্টু উঠে দাঁড়াল।

কোথায় চললেন ?

ছেলেটার নাম জানেন ? ডান দিক না বাঁ দিক, কোন দিকের কোয়ার্টারে সে থাকে ?

আপনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। বসুন।

উত্তেজিত হবো না! কি বলছেন ? সমাজের এই সমস্ত দুষ্ট গ্রহদের শিক্ষা না দিলে নিজেদের অপরাধী করে তোলা হয়।

রত্না কেমন বিপন্না হয়ে পড়ল।

বসুন সুকুমারবাবু। তাকে হঠাৎ কিছু বলতে গেলে কেলেঙ্কারি বাঁধবে, আমার জন্যে দিদি-জামাইবাবু খুব অসুবিধায় পড়ে যাবেন।

সুকুমার বসে পড়ল।

কিন্তু একটা কিছু করতে তো হবে?

ভেবেচিন্তে করবেন।

কুট্টুর মন হঠাৎ রসসিক্ত হয়ে উঠল। সে কি কোনদিন কল্পনা করেছিল, কোন তরুণী তার কাছ থেকে একদিন এইভাবে সাহায্য চাইবে? এবং তার জন্য সে উত্তেজিত হয়ে পড়বে? অচেনা দুষ্কৃতিকারীর কাছে ছুটে যেতে চাইবে? সে চিন্তা করে দেখে নি, পাশের কোয়ার্টারের ছেলেটি যদি তাকে প্রশ্ন করে বসত, ভদ্রমহিলা আপনার কে? কোন্ অধিকারে আপনি এই ব্যাপারে মাথা গলাচ্ছেন? তখন?

এই প্রশ্নের উত্তর দেবার মত উত্তর কি তার কাছে আছে? অধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নের নিষ্পত্তি বোধ হয় সর্বাগ্রে প্রয়োজন। স্বীকার করতে সঙ্কোচ নেই, বহু রাত আজকাল সে বিনিদ্র থাকছে। এমন একটি মুহূর্ত কি তার হাতে আসছে, যখন রত্নাকে মন থেকে সরিয়ে দিতে পেরেছে? ও-পক্ষের মনোভাব কি তা জেনে নিতে দোষ কি?

রত্নার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নিয়ে কুট্টু বলল, আপনাকে একটা প্রশ্ন করবার জন্য ব্যস্ততা বোধ করছি।

বলুন?

আমাকে আপনার ভয় করে না?

আপনাকে! কেন?

আমি পুরুষ, পাশের কোয়ার্টারের ছেলেটিও পুরুষ—

অবাক দৃষ্টিতে রত্না কুট্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি ও আপনি ছাড়া বাড়িতে উপস্থিত আর কেউ নেই—

আপনি কি বলতে চাইছেন সুকুমারবাবু?

দুর্বোধ্য কিছু বলতে চাই নি। আমার প্রশ্ন হল, পাশের কোয়ার্টারের ছেলেটির মত আমিও যে এই নিরিবিলি মুহূর্তে আপনাকে উত্যক্ত করে তুলতে পারি, এ আশঙ্কা আপনার মনে জাগছে না কেন?

আপনি···আপনি দিদি-জামাইবাবুর পরিচিত লোক। আমার সঙ্গেও পরিচয় হয়েছে। কোন সম্মানহানিকর কাজ আপনি করতে পারেন না।

আপনি জানেন না, পরিচিত লোকরাই অন্যায় সুযোগ বেশি নেয়।

না···মানে···

রত্না আর কিছু বলতে পারল না। অসহায়ভাবে বসে রইল চুপচাপ।

নীরবতার মধ্যে দিয়ে মিনিট পাঁচেক বোধ হয় কাটল।

কুট্টু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার প্রশ্ন অপনাকে বিপন্ন করে তুলেছে বুঝতে পেরেছি। আমার সম্পর্কে কিছু সন্দেহও হয়তো মনে দানা বাঁধছে। কাজেই এখানে আর অপেক্ষা করা শোভন হবে না। চলি। ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিন, বিপদের আশঙ্কা থাকবে না।

কুট্টু বারান্দা থেকে বাগানের সিঁড়িতে পা দিল।

শুনুন···

অস্পষ্ট গুঞ্জনের মত শোনাল। ঘুরে দাঁড়াল কুট্টু।

আপনি আমার সম্পর্কে ভুল ধারণা নিয়ে যাচ্ছেন, অবিশ্বাস আপনাকে আমি করি নি।

কেন?

এ কেনর উত্তর নেই সুকুমারবাবু।

কুট্টুর ঠোঁটের আগায় দুষ্টুমির হাসি—আছে; আপনি বলতে চাইছেন না।

বিব্রত রত্নাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আরো বিব্রত হতে

হল না, আটটার সময় আসবার কথা থাকলেও সস্ত্রীক অনন্তবাবু রেবুকে নিয়ে অনেক আগেই ফিরে এলেন। রত্না যেন বেঁচে গেল।

কুট্টু হতাশ হল কিঞ্চিৎ।

রেবু এগিয়ে এসে বলল, এখন আমি কিন্তু আর পড়ব না সুকুমার-কাকা।

তার কথায় সকলে হেসে উঠলেন।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত ছিল।

সুকুমার নিশ্চিত হয়ে গেছে রত্নার মনোভাব সম্পর্কে। তবু সে মনের কথা পরিষ্কারভাবে শুনতে চায় এবং তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় ততই ভালো। কিন্তু এরপর দিন পনেরোর মধ্যে রত্নাকে একা পেল না সে। গেছে নিয়মিত। রেবুকে পড়িয়েছে, অনন্তবাবু বা বৌদির সঙ্গে দু-চারটে কথা বলেছে, তারপর রওনা দিয়েছে বাস ধরার উদ্দেশ্যে।

রত্নার সঙ্গে প্রতিদিন দেখা হয়েছে, কথা হয় নি। কি বিরক্তিকর পরিস্থিতি। কুট্টু মরিয়া হয়ে উঠল। এই পরিস্থিতির আওতা থেকে সে বেরিয়ে আসতে চায়, একান্তে প্রাণ খুলে কথা বলতে চায় রত্নার সঙ্গে। সুযোগ—যে-কোন উপায়ে সুযোগ সংগ্রহ তাকে করতে হবে।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় অভাবনীয়ভাবে সুযোগ এসে গেল—একেই বোধ হয় সুবর্ণ সুযোগ বলে। অনন্তদা অফিসের কাজে কলকাতা গিয়েছে, পড়াতে গিয়ে একথা শুনল কুট্টু। বৌদিকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে সে খুশি হত। তবে এরপর যা ঘটল তাতে আনন্দে উপচে পড়া ছাড়া কুট্টুর আর অন্য কোন পথ রইল না

তাকে দেখে বৌদি বললেন, তোমার কথা ভাবছিলাম ভাই, মুঙ্গের রোডে আমাকে একবার পৌঁছে দিতে হবে।

কুট্টু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, মুঙ্গের রোডে কেন?

আমাদের মহিলা সমিতির অফিস যে ওখানে। আজ মিটিং

আছে। তুমি পৌঁছে দাও, ফিরে আসবার সময় আর সকলের সঙ্গে চলে আসব।

আশার আলোয় তার মন আলোকিত হয়ে উঠল।

আমিও তোমার সঙ্গে যাব মা! রেবু আব্দার ধরে বসল।

না; ছোট মেয়েদের সেখানে যেতে নেই, তুমি এখন পড়বে। আমাকে পৌঁছে দিয়েই তোমার সুকুমারকাকা ফিরে এসে তোমাকে পড়াবেন।

বৌদি তৈরি ছিলেন, বেরিয়ে পড়লেন কুট্টুর সঙ্গে। নত্রদাম একাডেমির কাছে রিক্সা পাওয়া গেল। এরপর মহিলা সমিতিতে পৌঁছতে মিনিট পনেরোর বেশি লাগল না। বৌদিকে নামিয়ে ওই রিক্সাতেই কুট্টু কুইন্স রোডে ফিরে এল। রেবু বইখাতা সরিয়ে তখন একটা প্লাইউডের বোর্ডের ওপর জলছবি তুলছিল। সুকুমারকাকাকে দেখে তটস্থ হয়ে উঠল।

পড়া ছেড়ে তুমি এসব কি করছ?

রেবু সঙ্কুচিত হয়ে রইল।

কুট্টু চেয়ারে বসে বলল, পড়ায় তোমার মন নেই, সব সময় ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছ আমি লক্ষ্য করছি।

খাতা টেনে নিয়ে গোটা ছয়েক অঙ্ক দিয়ে বলল, এগুলো করো, নির্ভুল না হলে ভীষণ বকুনি খাবে। আমি পাশের ঘরে আছি, হয়ে গেলেই আমাকে ডাকবে।

কুট্টু পাশের ঘরে গেল।

রত্না জানলার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল; পায়ের শব্দে ফিরে তাকিয়ে বলল, পড়ানো হয়ে গেল?

না; টাস্ক দিয়ে এলাম। একটু থেমে বলল, রেবুকে টাস্ক দিয়ে এ-ঘরে চলে এলাম, কেন বলুন তো?

আপনি বলুন।

এ-ঘরে এলাম সেদিনের অর্ধসমাপ্ত কথা শেষ করে নিতে।

রত্না কিছু বলল না। আবার জানলার দিকে তাকাল।

চুপ করে থাকবেন না, আপনার উত্তরের ওপর আমার বিরাট এক সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে।

মুখ না ফিরিয়ে রত্না বলল, সমস্যা! আমি কি আপনাকে সমস্যায় ফেলে দিয়েছি?

আমার মনের অবস্থার সঠিক ছবি কাউকে দেখানো সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলতে পারি, গত কয়েক রাতে আমার চোখে ঘুম আসে নি। অবিরাম চিন্তা করেছি। কেন ঘুম আসে নি, কি চিন্তা করেছি —জানি, অনুমান করে নিতে আপনার কষ্ট হচ্ছে না। আমি শুধু জানতে চাই, আমার শোচনীয় মনের অবস্থা আপনার হৃদয় স্পর্শ করেছে কিনা?

আমি···

থামবেন না, বলুন?

ফিরে না দাঁড়িয়েই রত্না বলল, আমি কি বলব?

কুট্টু এগিয়ে গেল। ওর পিছনে দাঁড়িয়ে বলল, আমি এত কথা বলে যাচ্ছি, আর আপনি সামান্য একটা—

আপনি অবুঝের মত যদি শুধু প্রশ্ন করে যান, সে অপরাধ কি আমার?

কুট্টুর মনে হিল্লোল জাগল। সত্যি তো, সমস্ত কথা যে মুখ ফুটে বলতে হবে, তার কি অর্থ আছে। সম্মতি না থাকলে সে কি এত কথা বলতে পারতো? তার আগে কি তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে তাকে থামিয়ে দেওয়া হত না?

সংযমের বাঁধকে আর বেঁধে রাখা গেল না। উচ্ছ্বসিত গলায় কুট্টু বলল, রত্না···

সুকুমারকাকা এই অঙ্কটা বুঝতে পারছি না, এসে বুঝিয়ে দিয়ে যাও না।

স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করবার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল যেন, রেবুর আহ্বানে ছত্রখান হয়ে গেল সমস্ত। বিরক্ত মনে পাশের ঘরের দিকে এগোল কুট্টু। কয়েক পা এগিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, পাহাড়ের

কাছের গল্‌ফ মাঠে কতকগুলো আম গাছ আছে, কাল সকাল সাড়ে আটটার সময় আমি ওখানে অপেক্ষা করব।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কুট্টু।

রাত্রে কুট্টু হাল্কা মনেই বিছানায় আশ্রয় নিয়েছিল। অনেক কথা ভেবেছিল। ভাবতে ভালো লাগছিল তার। একটি মেয়ের মনে দাগ কেটে যাওয়া সহজ কথা নয়। ইচ্ছে করছিল, নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে দেয়। তবে—

তবে একটা সন্দেহ মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছে। সঙ্কোচকে জয় করে রত্না কি আসবে তার কথামত? হয়তো আসবে না। কুট্টু অবশ্য নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে উপস্থিত হবে, দেখবে শেষ পর্যন্ত কি হয়। ভাবতে ভাবতে ঘুম এসেছিল প্রায় মাঝরাতে।

বিস্তৃত গল্‌ফ মাঠ। এখানে-ওখানে জমি উঁচু করে অবস্ট্রাক্‌সন সৃষ্টি করা হয়েছে খেলার নিয়মানুসারে। ওই মাঠের মধ্যেই গোটা কুড়িক আমগাছ আছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কবে এবং কে এই গাছ পুঁতেছিল এখন বলা কঠিন।

গাছগুলির হাত দশেক দূর দিয়ে পিচ-ঢালা রাস্তাটা গেছে। রাস্তা টপকে আর সমতল জমি পাওয়া যায় না। দু ফুট, আড়াই ফুটের পাহাড় মাথা উঁচিয়ে আছে। এগুলির বিরাট আকার নিতে কম করে এক লক্ষ বছর লাগবে। তবে তিল তিল করে প্রতিদিন যে নিজেদের উচ্চতা বাড়িয়ে চলেছে তাতে সন্দেহ নেই।

শিশু-পর্বতমালার আওতা পার হলেই পাওয়া যাবে ঝিল। বেশ চওড়া আকারে, এঁকেবেঁকে চলে গেছে দৃষ্টি সীমার বাইরে। ঝিল সৃষ্টি হয়েছে জলপ্রপাতের জলে। সারা বছর ধরে অবশ্য পাহাড় গড়িয়ে জল পড়ে না, পড়ে দু-আড়াই মাস ধরে।

ঝিলের একপাশে সুউচ্চ পাহাড়। তার তলায় গিয়ে দাঁড়ালে নিজেকে অত্যন্ত ছোট বলে মনে হয়। মনে হয়, বিন্ধ্যাচল রেঞ্জের এই

বিরাট শাখা চরম গাম্ভীর্য নিয়ে তাকিয়ে আছে দূর-দূরান্তের দিকে।

কুট্টু সওয়া আটটার সময় আমগাছের তলায় এসে দাঁড়াল। এই পাহাড়ে এসেছে অজস্রবার পিকনিক করতে। কয়েকজন বন্ধু মিলে খেয়াল-খুশি মত চলে গেছে মাইল পনেরো-কুড়ি দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে। একবার তো পথ হারিয়ে গিয়ে প্রাণ প্রায় যেতে বসেছিল। জঙ্গলে হিংস্র জন্তুর অভাব নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছায় শেষ পর্যন্ত দিক ঠিক করতে পেরে ফিরে আসতে পেরেছিল।

সাড়ে আটটা বেজে গেল; রত্নার দেখা নেই। ন'টা পর্যন্ত এখানে কুট্টু অপেক্ষা করবে, ফিরে যাবে তারপর। ন'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল না, পৌনে ন'টার সময় দেখা গেল নির্জন রাস্তা দিয়ে মন্থর পায়ে এগিয়ে আসছে রত্না। অবিশ্বাস্য হলেও দৃশ্যটি বাস্তব। হর্ষোৎফুল্ল মনে কুট্টু তাকিয়ে রইল।

রত্না এগিয়ে এল, কাছে—অনেক কাছে। তবে আমতলায় এল না—দাঁড়াল এসে রাস্তার ওপর, তার সামনা-সামনি। ওর মুখে সঙ্কোচ আর দুঃসাহসের ভাব যেন মাখামাখি হয়ে রয়েছে।

কুট্টু এগিয়ে গেল, আমি ভাবলাম, তুমি বুঝি আসবে না।

রত্না কিছু বলল না।

এস, আমরা ওধারে গিয়ে বসি।

দুজনে এগিয়ে গেল। ভাবী পাহাড়ের চত্বর পিছনে ফেলে দুজনে শালগাছের তলায়, ঝিলের ধারে গিয়ে বসল।

রত্না—

রত্না মুখ তুলল।

তুমি যে আমার পাশে এসে বসেছ, এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না।

অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে আসতে হয়েছে।

একবারও কি মনে হয় নি, গিয়ে কাজ নেই।

ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে রত্না বলল, মনে হয়েছিল।

ছোট একটা ঢিল ঝিলের জলে ফেলল কুট্টু, তবু এলে যে?

আপনি অপেক্ষা করে থাকবেন—

শুধু ওই কারণে এলে? আমার তো বিশ্বাস হয় না, আমি আসব বলেই এসেছ। কে জানে, হয়তো আসবার জন্য ব্যস্ততাও বোধ করেছ।

আজকের যুগে এত স্পষ্ট কথা বলবেন না।

রত্না—

উঁ—

আপনির বেড়া টপকে তুমিতে এসে পড না।

রত্না জলের দিকে তাকিয়ে বলল, একদিনে এত বাড়াবাড়ি ভালো নয়।

কুট্টু হাসল। ভালো নয় বলছ বটে, কিন্তু ব্যস্ত হয়ে পড়েছ।

না—না—

আমি তোমার মনের কথা বুঝতে পারছি যে।

এত আত্মবিশ্বাস!

আত্মবিশ্বাসের জোরে মানুষ ভিখারী থেকে রাজা হয়ে গেছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। তাছাড়া পরশুরামের সেই গল্পটার কথা ভুলে গেলে? তিনি বলেছেন, মেয়েদের না বলার অর্থই হল হ্যাঁ বলা।

তা হবে।

এত ছোট্ট করে উত্তর দিলে হবে না, তুমি আমার মত অনেক কথা বল রত্না।

রত্নাও একটা ঢিল জলে ফেলল। ছোট থেকে বড়, তারপর আরো বড় হতে লাগল জলের চক্র।

আপনার সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। আমাকে এখানে আসতে বলবেন, ভাবতে পারি নি।

তোমার সাহস দেখেও আমি কম অবাক হচ্ছি না। আমার সমস্ত পরিচয় তোমার হয়তো এখনও জানা নেই, অথচ এক ডাকেই তো চলে এলে।

রত্না কথার মোড় ঘোরাল, এখানে কেউ এসে পড়তে পারে।

আসবেই তো; ক্ষতি কি?

পরিচিত কেউ এসে পড়লে ভীষণ লজ্জার বিষয় হবে।

পরিচিতরা এখন কেউ এখানে আসবে না।

আসবে না! আপনি জানলেন কিভাবে?

ওয়ার্কসপ চলছে। সকলে কাজে গেছে। কেউ সর্বজ্ঞ নয়, কাজেই আমরা কি করছি না করছি দেখবার জন্য অফিস কামাই করে এখানে আসবার মাথাব্যথা কারোর নেই।

রত্না হাসল, কিছু বলল না।

দুজনেই চুপচাপ কিছুক্ষণ।

শেষে—

আমি এবার উঠি।

বিস্মিত গলায় কুট্টু বলল, এই তো এলে, এখুনি উঠবে কি?

এতটা পথ আবার যেতে হবে। দেরী করলে, দিদি সন্দেহ করতে পারেন।

আবার কবে এখানে দেখা হবে বল?

আগামী সপ্তাহে।

না; কাল।

না, না, এত তাড়াতাড়ি নয়।

আমি কিন্তু কাল তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

রত্না উঠে পড়ল। ঢালু পথ ধরে এগিয়ে চলল পিচঢালা রাস্তার দিকে।

আসছ তো?

মুখ ফিরিয়ে একবার কুট্টুকে দেখে নিয়ে আবার চলতে চলতে বলল, এত বাড়াবাড়ি ভালো নয়।

বাড়াবাড়ি ভালো নয় বললেও পরের দিন ঠিক সময়েই রত্না এল। এবং তার পরের দিনও। দিন এগিয়ে চলার সঙ্গে তাদের হৃদ্যতাও গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগল।

ইতিমধ্যে কুট্টু কাজে যোগ দিয়েছে। কাজে যোগ দেবার পর

আর দুজনের সাক্ষাত পাহাড়ের ধারে সকালে হয় না। অনেক মাথা খাটিয়ে, সকলের চোখ বাঁচিয়ে দেখা-সাক্ষাত করে মনের কথা আদান-প্রদান করতে হয়।

তিন মাস কেটে গেল এইভাবে।

সন্ধ্যা হওয়ার মুখে সেই চির নতুন জায়গায় আজ আবার দুজনের সাক্ষাত হল। রত্না আগেই এসেছিল, কুট্টু এল অফিস থেকে সরাসরি। দুজনে বসল শালগাছের তলায় জল-ঘেঁষে।

কুট্টু রত্নার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিল।

আজ যে কত কায়দা করে এখানে আসতে হয়েছে কি বলব।

কেন?

অফিস থেকে বেরুচ্ছি, এক বন্ধু ধরে বসল বাজারে যেতে হবে। তার বোনের বিয়ে—কি সমস্ত কেনাকাটা করতে হবে। তাকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তবে আসতে পেরেছি। তোমার সঙ্গে আমার একদিন দেখা হবে না, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

মাসের পর মাস আমাকে না দেখে থাকবে কিভাবে?

মাসের পর মাস! তার মানে?

আমি চলে যাচ্ছি!

মনের মধ্যে কুট্টু প্রচণ্ড ধাক্কা খেল।

কবে?

দিন ছয়েকের মধ্যে।

না, তোমার যাওয়া চলবে না।

তুমি তো চলবে না বলেই খালাস। আমি তো চিরদিন এখানে থাকতে আসি নি। বাড়ির লোকেরা আমাকে এখানে রেখে গিয়েছিলেন, এবার তাঁরা আমায় নিয়ে যাবেন।

কিন্তু…

কিন্তু কি, বল?

কিন্তু আমাদের এই মেলামেশা, এই অন্তরঙ্গতা—এর কোন মূল্য হবে না? তোমাকে তো চলে যেতে দিতে পারি না রত্না! একটা

পরিণতি চাই, শুভ পরিণতি।

আমায় কি করতে বল?

তুমি নিশ্চয় চাইবে, বাকি জীবন আমরা দুজন একই সঙ্গে থাকব? আমাদের বিয়েতে তোমার নিজের লোক, কি অন্য কেউ আপত্তি করবেন?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তা তারা করবেন না।

আমি আজই বাড়িতে কথা পাড়ব। চাকরি পাবার পর থেকেই মা পাত্রী খুঁজছেন, বিয়েতে তিনি নিশ্চয়ই মত দেবেন। এরপর আর একটা বিষয় বাকী রইল।

আবার কোন বিষয়?

মৃদু হেসে কুট্টু বলল, তোমার মত। তোমার মত না পেলে তো এক ইঞ্চি এগুবার উপায় নেই। বল না, আমাকে কি তোমার খুব অপছন্দ?

মাথা নত করল রত্না। একটু হেসে বলল, ভীষণ।

উৎফুল্ল কুট্টু ওকে নিজের দিকে আকর্ষণ করল।

মায়ের মত পেতে বিশেষ অসুবিধা হল না। অবশ্য সরাসরি কথাটা তাঁর কাছে পাড়তে তার সঙ্কোচ হয়েছে, বৌদির সাহায্যে কার্যোদ্ধার করতে হল। এখন দ্বিতীয় কাজ হল, অনন্তদার স্ত্রীকে কথাটা প্রকারান্তরে জানিয়ে দেওয়া। যাতে তিনি সমস্ত কিছু পাকা করে ফেলতে পারেন।

আজ অফিস ছিল না, ঈদের ছুটি। পাঁচটার ট্রেনে কুট্টু জামালপুর গেল। অসম্ভব আনন্দ তাকে উতলা করে রেখেছে। কি শুভক্ষণে সেদিন গিয়েছিল কষ্টহারিণী-ঘাটে বেড়াতে, না গেলে অনন্তদার সঙ্গে দেখা হত না। রেবুকে পড়াবার কথা বলতে পারতেন না। রেবুকে পড়াতে না এলে রত্নার সঙ্গে দেখা হত না।

স্টেশনের বাইরে এসে ছোট ব্রীজটা অতিক্রম করে কুইন্স রোডের পথ ধরল কুট্টু। বরফ ফ্যাক্টরী পেরিয়ে কিছুদূর এগিয়েছে, এমন

সময় জন চারেক ছেলে তার পথ রোধ করল। বাইশ থেকে আঠারোর মধ্যে বয়স তাদের। কলার খাড়া করা, ড্রেন-পাইপ ট্রাউজার পরা অতি আধুনিক তরুণের দল। একজনের চেহারা আবার পালোয়ানদের মত।

একজন বলল, কি মশাই, কি ভেবেছেন আপনি?

বিস্মিত কুটু বলল, আমায় বলছেন?

এখানে আর কেউ আছে নাকি? আপনি এত ঘনঘন কুইন্স রোডে কেন আসেন বলতে পারেন?

টিউশানি করি।

সকলে টেনে টেনে হাসল।

আরেকজন বলল, ও তো লোক দেখানি। আসলে কি করতে যান, জানি আমরা।

মুঙ্গের থেকে এখানে এসে প্রেম করা হচ্ছে।

কাঁপা গলায় কুটু বলল, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আপনারা কেন ইন্টারফেয়ার করছেন বুঝতে পারছি না।

ঘটে বুদ্ধি থাকলে বুঝতে কষ্ট হত না।

পথ ছাড়ুন, রাস্তার মাঝে এইভাবে কাউকে আটকানো ভদ্রতা নয়।

একজন চড়া গলায় বলল, বলে কি!…রামুদা, তোমার উপস্থিতিতে আমাদের ভদ্রতা শেখাচ্ছে!

রামুদা, অর্থাৎ পালোয়ান চেহারার লোকটি এবার নিজের বাজখাঁই গলা ছাড়ল। সে আর সকলের চেয়ে বয়সে বড়। বলল, ওহে ছোকরা, বেশি কোপচিও না। ওই তো চেহারা, এক রদ্দায় ঠাণ্ডা হয়ে যাবে!

কুটুর অবস্থা বেশ শোচনীয় হয়ে উঠল। রদ্দা না খেয়েই সে বুঝতে পারছিল, রামুদার রদ্দা তার পক্ষে বিশেষ সুখকর হবে না।

সে গলা ঝেড়ে নিয়ে বলল, আমার অপরাধটা কি, আমি বুঝতে পারছি না।

বুঝতে ঠিকই পারছ, ন্যাকা সাজবার চেষ্টা করছ শুধু। রামুদা বললেন, এ-পথ তোমার আর মাড়ানো চলবে না। যদি আমার কথা অমান্য করো, মোরব্বা বানিয়ে ছেড়ে দেব। এমন কাউকে দেখতে পাবে না যে তোমাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসবে।

কিন্তু...

স্যাট-আপ! মুখের ওপর চোপা আমি পছন্দ করি না। যা বললাম, অক্ষরে অক্ষরে তা মনে রাখবে।

রামুদা দলবল নিয়ে অগ্রসর হলেন।

অপমানে জর্জরিত কুট্টু দাঁড়িয়ে রইল, তার ওপর যেন মধ্যযুগীয় অত্যাচার হয়ে গেল। এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার সাধ্য এই মুহূর্তে তার নেই, কিন্তু মুখ বুজে সহ্য করবে না, যে কোন উপায়ে প্রতিশোধ নেবেই।

রামুদার দল তখন ব্রীজের ওপর উঠে পড়েছে। কুট্টু এগোতে যাবে, এমন সময় অমিয় এসে উপস্থিত হল। অমিয় সান্যাল—চার বছরের কলেজ-জীবন কেটেছে দুজনের পাশাপাশি বসে। কুট্টুর আগেই ওয়ার্ক-সপে চাকরি পেয়েছিল। সাইকেল থেকে নেমে সে বলল, ওরা তোমার গায়ে হাত দেয় নি তো?

না।

আমি দূর থেকেই তোমাকে দেখতে পেয়েছিলাম। খুব বেঁচে গেছো, রামুদা সাজ্ঘাতিক লোক।

হোক সাজ্ঘাতিক! তোমাদের রামুদাকে ভয় করে আমি চলব না, তুমি দেখে নিও।

দেখ সুকুমার, অবিবেচকের মত কিছু করে বস না। আমি জানতাম না, তলায় তলায় এত ঘোরাল কাণ্ড বাধিয়ে তুলছো। জানতে পেরেছি আজ সকালে। আগে জানলে, নিশ্চয় তোমাকে সাবধান করে দিতাম।

একজন মহিলার সম্মান যে বিপন্ন হয়েছে, সে-সম্পর্কে ওদের সচেতন করে দিচ্ছ না কেন?

তুমি কার কথা বলছ ?

কেন, রত্নার।

একটু ইতস্তত করে অমিয় বলল, কিছু মনে কোরো না ভাই, মহিলা বলতে যা বোঝায়, সেই দৃষ্টিকোণ দিয়ে তোমার রত্নাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। তাই সাবধান করতে চাইছিলাম।

তার মানে ?

যা হবার হয়ে গেছে, এখনও সাবধান হও।

তুমি কি বলতে চাইছ ?

মেয়েটি ভালো নয়।

কুট্টু প্রায় চিৎকার করে উঠল, কি আজেবাজে কথা বলছ। রত্না আমাকে ভালবাসে, আমি তাকে বিয়ে করতে চলেছি!

মহাবিস্ময়ে অমিয় বলল, বিয়ে করতে চলেছ! আমি তোমাকে বুদ্ধিমান বলে মনে করতাম। আমার ধারণা হয়েছিল, মধু চুষে নিয়ে আর ফুলের দিকে তাকাবে না। বিয়ে করার পাগলামি মাথায় চাপবে, ভাবতে পারি নি।

অমিয়···

আমাকে চোখ রাঙাতে পারো—আর সকলে তোমার নির্বুদ্ধিতায় হাসবে।

আমি কোন কথা শুনতে চাই না।

শুনতে না চাইলে আমি নাচার। অনন্তবাবুর ওখানে যাচ্ছ বোধ হয়? যাও। তবে যাবার আগে আমার একটা কথা শুনে রাখো, এই জামালপুরে তোমার মত আরও অনেককে তোমার রত্না নাচাচ্ছে। যারা তোমাকে ধমকে গেল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সঙ্গ-সুখ পেয়ে থাকে।

কুট্টু অমিয়র পথ রোধ করল, তুমি মিথ্যে কথা বলছ।

আমার লাভ ?

তুমি জেলাস। রত্নাকে আমি ট্যাক্‌ল করতে পেরেছি, তোমার তা সহ্য হচ্ছে না।

অমিয় জোরে হেসে উঠল।—তুমি পাগল হয়ে গেছ—কলকাতার একটা সোকল্ড মেয়ে তোমাকে বদ্ধ উন্মাদ করে ছেড়েছে। শোন সুকুমার, রত্নাকে আমি চিনি তোমার সঙ্গে আলাপ হবার অনেক আগে থেকে। হাজরা রোডে ওদের বাড়ি, আমার মামার বাড়ির পাশেই। ওর অনেক কেচ্ছা-কাহিনী আমার জানা আছে। এমন কি যার জন্য জামালপুরে এসে থাকা, সেই অ্যাবরশান কেসটির কথাও।

অ্যাবরশান !—কুট্টু আকাশ থেকে পড়ল।

যে মেয়ে এদিক-ওদিক থিয়েটার করে বেড়ায়, রাতে-বেরাতে বাড়ির বাইরে থাকে, তার যদি দু-একটা অ্যাবরশান হয়, আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

তুমি বলতে চাও, সমস্ত জেনে-শুনেও অনন্তদা—

তিনি ভালমানুষ, এত সাত-পাঁচের সংবাদ রাখেন না। ওর বাপ-মা তারই সুযোগ নিয়েছে। এদিকে মেয়ে এখানে এসেও নাচিয়ে বেড়াচ্ছে একগাদা ছেলেকে।

প্রায় পাঁচ-মিনিট কোন কথা বলল না কুট্টু। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, তুমি নিজের কথা প্রমাণ করতে পারবে ?

কোন্ কথা ?

রত্নার সম্পর্কে যা বললে ?

অন্তত এটুকু প্রমাণ করে দেব, জামালপুরের আরো ছেলের সঙ্গে সে দহরম-মহরম করছে।

বেশ। কবে…?

কাল পরশুর মধ্যে অফিসে তোমায় জানিয়ে দেব।

কুট্টু আর দাঁড়াল না, অমিয়কে পাশ কাটিয়ে অনন্তদার কোয়ার্টারের দিকে অগ্রসর হল। তার মন সন্দেহের দোলায় প্রচণ্ডভাবে দুলছে। রত্নার আন্তরিকতায় এতখানি খাদ আছে কল্পনা করতে কষ্ট হয়। অথচ অমিয় বলছে—তার মিথ্যে কথা বলে লাভ কি ?

তবু শুধু কথায় রত্নাকে অবিশ্বাস করবে না সে, চাক্ষুস প্রমাণ তার

চাই। অনন্তদা কোয়ার্টারে ছিলেন না; রত্না বসেছিল ড্রইংরুমে। বৌদি রান্নায় ব্যস্ত ছিলেন। কুট্টু রেবুকে নিয়ে পড়াতে বসল। আজকাল অবশ্য নিয়মিত পড়াতে পারে না। আধ ঘণ্টাটাক পরে ওকে টাস্ক দিয়ে কুট্টু ড্রইংরুমে এল।

মিষ্টি করে হাসল রত্না।

স্বাভাবিক গলায় কুট্টু বলল, বাড়িতে বলেছিলাম।

তাই নাকি! কি বললেন?

ভায়া বৌদি কথাটা মাকে পৌঁছাতে হয়েছিল। তাঁর অমত নেই। এবার অনন্তদার কানে কথাটা তুলে দিতে চাই।

এখন থাক; ভীষণ লজ্জায় পড়ে যাব। আমি চলে যাই, তারপর বোলো।

বিয়ের পর আমরা বেরিয়ে পড়ব—বিদেশী কায়দায় হনিমুন আর কি। কোথায় যাওয়া যাবে বলো তো?

পুরী!

কুট্টু আপত্তি তুলল, পুরী! না, না, পুরী নয়। আমরা নৈনিতাল যাব। ওখানে আমাদের চমৎকারভাবে দিন কাটবে।

রত্না একটু হেসে বলল, আপাতত তুমি পাশের ঘরে যাও, দিদি যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারেন।

কুট্টু দ্বিরুক্তি না করে রেবুর কাছে ফিরে গেল।

পরের দিন দুজনের সাক্ষাৎ হল যথা-নিয়মে শালগাছ তলায়। অনেক কথা হল। ভবিষ্যতের অনেক রঙ্গীন স্বপ্নকে ওরা নেড়েচেড়ে দেখবার চেষ্টা করল। এক সময় কুট্টু বলল, ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক কথা হল, এবার বর্তমান নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

রত্না হাসতে হাসতে বলল, বেশ তো, আরম্ভ করে দাও।

অমিয় তোমার সম্পর্কে একটা কথা বলছিল।

আমার সম্পর্কে! অমিয় কে?

আমার বন্ধু। ও বলছিল, তুমি নাকি আমাকে রঙ-বক্সের মধ্যে

পুরে রেখেছ। জামালপুরে আরো অনেকের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে।

মিথ্যে কথা! রত্নার মুখ লাল হয়ে উঠল। ও দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, তোমার বন্ধু তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছে। ছি, ছি, ছি, তুমি তার কথা বিশ্বাস করে আমাকে প্রশ্ন করছ!

আমাকে ভুল বুঝো না রত্না, তার কথা বিশ্বাস করলে আমি তোমাকে প্রশ্ন করতাম না।

মনের মধ্যে কিছু সন্দেহ আছে বলেই তুমি প্রশ্ন করেছ।

না, না, তা নয়; কোন রকম মনে সন্দেহ না রেখেই আমি প্রশ্ন করেছিলাম। যাক ও-কথা, সহজেই আমরা আবার পুরোন আলোচনায় ফিরে যেতে পারি।

রত্না গম্ভীর মুখে বসে রইল।

এই, রাগ করলে?

আমি শুধু ভাবছি, তুমি আমাকে ওই প্রশ্ন করলে কিভাবে!

কুট্টু নরম গলায় বলল, ভুল হয়ে গেছে, তুমি আমাকে ক্ষমা কর রত্না। ক্ষমা না করলে, আমার দুশ্চিন্তার শেষ থাকবে না। বল, ক্ষমা করলে?

মৃদু হেসে রত্না বলল, ভীষণ ছেলেমানুষ তুমি।

পরের দিন ছুটোর সময় অফিস থেকে কুট্টু সরে পড়ল। অমিয় বলেছে, হাতে হাতে প্রমাণ যদি চাও, এই সময় তোমাকে রওনা দিতে হবে। আমি সংবাদ পেয়েছি, এই সময় তোমার রত্না ওয়াটার ওয়ার্কসের পিছন দিকের নির্জন জায়গায় অভিসারে গিয়ে থাকে।' সুতরাং কুট্টু রওনা দিয়েছে।

হাসপাতালের সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা ধনুকের মত বেঁকে চলে গেছে, সেই রাস্তা ধরেই কুট্টু এগুলো। কিছুদূর থেকে ওয়াটার ওয়ার্কসের রেলিংঘেরা রাস্তা আরম্ভ হয়েছে। গেট দিয়ে না ঢুকে ভেঙে যাওয়া রেলিঙের মধ্যে দিয়ে সে শর্টকাট করল।

এগিয়ে যেতে যেতে কুট্টুর বারংবার মনে হচ্ছে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে সে যেন কিছুই দেখতে না পায়, মিথ্যা প্রমাণিত হয় অমিয়র কথা। ওয়াটার ওয়ার্কসের পিছনে পৌঁছে গেল মিনিট কয়েকের মধ্যে। জায়গাটিকে পিকনিক প্যারাডাইস বলা হয়। ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে এখানে দল বেঁধে অসংখ্য মেয়ে-পুরুষকে পিকনিক করতে দেখা যায়।

কুট্টু একটা খাড়া পাথরের আড়ালে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে সতর্ক-ভাবে তাকাতে লাগল এধার-ওধার। যা দেখতে চায় না, সেই দৃশ্য চোখে ধরা পড়তে বিশেষ বিলম্ব হল না।

অবাক বিস্ময়ে কুট্টু দেখল, ঝিলের যে অংশ মোড় খেয়ে এইদিকে চলে এসেছে, তারই ধারে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে রত্না আরেকজনের সঙ্গে। কোন শব্দ ভেসে আসছে না, অত্যন্ত মৃদু গলায় কথাবার্তা হচ্ছে বোধ হয়।

কুট্টুর মাথার মধ্যে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। অমিয় তাহলে মিথ্যা কথা বলে নি! অথচ কি চমৎকার অভিনয় সেদিন রত্না করল। কি প্রয়োজন ছিল তার? আন্তরিকতাই যদি না হবে, তবে দিনের পর দিন ওকে কে বলেছিল অভিনয় করে যেতে?

দৃঢ় পায়ে কুট্টু এগিয়ে গেল। দুজনের খেয়াল নেই—আত্মবিস্মৃত দুই নারী-পুরুষ। ওদের পিছনে এসে দাঁড়িয়ে কুট্টু গম্ভীর গলায় বলল, চমৎকার!

চমকে দুজনে মুখ ফেরাল। কুট্টুকে দেখে রত্নার মুখ সাদা হয়ে গেল। ঘাম দেখা দিল কপালে। ওর সঙ্গী-ছেলেটিকে—সেদিন যারা রামুদার সঙ্গে ছিল, তাদের মধ্যে একজন বলে মনে হল। ছেলেটি উঠে দাঁড়াল। রত্নাও।

তুমি এই সময় আমায় এখানে আশা কর নি। ঘাবড়ে গেলে নাকি?

রত্না নিজেকে সামলে নিয়েছে; গম্ভীর গলায় বলল, ঘাবড়ে যাই নি।

জানি, তুমি ঘাবড়াবে না। তোমার মত মেয়ে এত সহজে ঘাবড়ায় না'।

রত্নার সঙ্গীটি কোন কথা না বলে দ্রুতপায়ে স্থান ত্যাগ করল।

তীক্ষ্ণ শ্লেষের সঙ্গে কুট্টু বলল, তোমাকে একলা ফেলে চলে গেল যে! চেপে ধর, একজন বডি-গার্ড না থাকলে অসহায় বোধ করতে পার।

বাজে কথা শোনার সময় আমার নেই, যা বলতে চাও তাড়াতাড়ি বল।

সময়ের অভাব তো বটেই। আরেকজন কোথাও অপেক্ষা করছে বুঝি?

সুকুমার…

চোখ রাঙিও না; তোমার কথায় অনেক উঠেছি-বসেছি, অনেক শিক্ষা হয়েছে আমার, আর নয়—। চোখ রাঙানোর অভিনয় দেখে, ভয়ে আর ইঁদুরের গর্তে গিয়ে লুকোব না।

রত্না অগ্রসর হল।

পথ রোধ করল কুট্টু। যাচ্ছ কোথায়? আমার মনকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে নষ্ট করে দিয়েছো—আর গোটাকতক কথা না শুনেই চলে যাবে!

কি বলবার আছে তোমার?

কি বলবা‹ নেই? কেন সতীপনা দেখাচ্ছিলে আমায়, দিনের পর দিন? তোমার মনোভাব যখন এইরকম, একজনকে নিয়ে যখন সন্তুষ্ট থাকতে পারো না—সেকথা আমায় জানিয়ে দিলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত কি?

রত্না তির্যক দৃষ্টিতে সুকুমারকে লেহন করে নিল যেন। ভ্রূ-ভঙ্গি করে বলল, তুমি এত বোকা আমি জানব কিভাবে? আমার মত কলকাতার মেয়ে আজ পর্যন্ত কোন পুরুষ-বন্ধু সংগ্রহ করতে পারে নি, একথা তুমি ধারণা করেছিলে কেন?

ধারণা করেছিলাম, তোমার সতীপনা দেখে! তুমি কেন আমার

কাছে দিনের পর দিন অভিনয় করেছিলে? আমি তোমার কোন ক্ষতি করি নি?

ক্ষতি! তুমি আমার কি ক্ষতি করবে? সে সাধ্য তোমার কোথায়? এটা আমার হবি। তোমার মত বোকা ছেলেদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে আমি আনন্দ পাই, বুঝলে? পথ ছাড়ো।

না।

না, মানে?

পথ ছাড়বো না! এই বোকা ছেলেটির কাছে এখন তোমায় কিছু শিক্ষা নিতে হবে।

আমি তোমার কেনা বাঁদী নাকি যে, পান থেকে চুন খসলেই শিক্ষা দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ছ?

তুমি আমার আন্তরিকতাকে ছুরি দিয়ে কেটে খান খান করে ফেলেছ রত্না—এখন ইচ্ছে করছে, তোমাকে কেটে আমি টুকরো টুকরো করে ফেলি।

তীক্ষ্ণ গলায় রত্না বলল, চমৎকার! কলকাতায় যাও না, ঐতিহাসিক নাটকে তোমার অভিনয় মন্দ জমবে না। কিন্তু আমার সহ্যের সীমা আছে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর পাগলামি দেখতে ভাল লাগে না।

ও কুট্টুকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল।

কুট্টু ওকে বাধা দিতে পারত, এক ঝটকায় ঝিলের জলের মধ্যে ফেলে দিতে পারত; জল থেকে যাতে উঠে আসতে না পারে, সে-ব্যবস্থা করাও অসম্ভব হত না—কিন্তু সে কিছুই করল না।

আত্ম-ধিক্কারে মরে যেতে ইচ্ছে করল তার, এই মেয়েকে চেয়েছিল বিয়ে করতে! ঈশ্বর আছেন, তিনি রক্ষা করেছেন।

কুট্টু ফিরে চলল। রত্না বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলে যে ওকে ধরা না যায়, তা নয়। কুট্টু আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে মন্থর পায়ে এগিয়ে চলল। ঠিক এই সময় আচম্বিতে একটা ঘটনা ঘটে গেল।

দলবল নিয়ে রামুদা ভুঁইফোড়ের মত উপস্থিত হলেন। ঘনিষ্ঠভাবে যে ছেলেটি রত্নার সঙ্গে বসেছিল, সেই বোধ হয় সংবাদ দিয়েছে গিয়ে। কুট্টু কিছু বলবার অবকাশ পেল না, প্রচণ্ড ঘুষি খেয়ে কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়ল। তারপর প্রচণ্ডভাবে পড়তে লাগল ঘুষি, চড় আর লাথি তার ওপর। অসহ্য যন্ত্রণায় তার জ্ঞান স্তিমিত হয়ে এল।

জ্ঞান হল হাসপাতালের বেডে।

কিভাবে সে ওখানে গিয়ে পড়েছিল কেউ বলতে পারল না। তবে এইটুকু জানা গেল, তার রক্তাক্ত অজ্ঞান দেহ পড়েছিল হাসপাতালের গেটের সামনে।

সুকুমার নিজের কাহিনী শেষ করল।

তারপর? মৃগাঙ্ক ঘোষ প্রশ্ন করলেন।

মৃদু হেসে সুকুমার বলল, তারপর আর কি, যন্ত্রণার তাড়নে জ্বর এসেছিল। দিন কুড়িক বিছানায় পড়ে রইলাম। সকলের প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য বলেছিলাম, পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে পা-পিছলে পড়ে গিয়ে এই বিপত্তি। অবশ্য অনেকের মনে প্রশ্ন থেকে গিয়েছিল, অফিস থেকে পালিয়ে আমি পাহাড়ে কেন বেড়াতে গিয়েছিলাম।

এক টিপ নস্যি নিয়ে মধুসূদনবাবু বললেন, তোমার অভিজ্ঞতা বেশ ইণ্টারেস্টিং।

তারপর থেকেই বুঝতে পেরেছি, পাইন অ্যাপেলের যুসে ভর্তি সব গেলাস মিষ্টি নাও হতে পারে। আমি আর ওধার মাড়াই নি।

মৃগাঙ্ক ঘোষ বললেন, এবার আমি উঠব, রাত অনেক হল। আমার এবং মিস্টার গুপ্তের অভিজ্ঞতার কথা কাল হবে, কিছু সময় হাতে করে আসব বরং। তিনি হাই তুলে উঠে দাঁড়ালেন।

বারান্দার ঘড়িতে সশব্দে এই সময় দশটা বাজল।

পরের দিন বেলা চারটের সময় সিলভার অ্যারোতে এলেন মৃগাঙ্ক

ঘোষ। ঘরেই ছিলেন দুজনে; সকাল ও দুপুর কোন কথা হয় নি মধুসূদন গুপ্ত ও সুকুমারের মধ্যে। নতুন করে পুরোন গল্প মনে পড়ে যাওয়ায় সুকুমার কেমন অস্বোয়াস্তি বোধ করতে থেকেছে। মধুসূদন গুপ্ত সুকুমারের কাহিনী শোনবার পর থেকে কিছু বিমনা রয়েছেন।

চা-পব শেষ হল।

মিস্টার ঘোষ এবার আপনি আরম্ভ করুন।—সুকুমার বলল।

আমি নয়, আমি সব শেষে বলব। মিস্টার গুপ্ত, আপনি বলুন।

মধুসূদন গুপ্ত আপত্তি করলেন না; বললেন, বেশ তো, আমিই আরম্ভ করছি। জানি না, আমি গুছিয়ে বলতে পারব কিনা। তবে আমার জীবনে যা ঘটেছে, অতি অল্প মানুষের জীবনে সেরকম মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে থাকে, একথা আগে বলে নিতে বাধা নেই।

তিনি আরম্ভ করলেন।

ছোটবেলা থেকেই মধুসূদন পড়াশুনায় অত্যন্ত ভালো ছিল। প্রথমে কিন্তু তার এই প্রতিভার কথা কারুর জানা ছিল না। জানা গেল, যখন সে স্কুলে ভর্তি হল। কাকা নিয়ে গিয়েছিলেন ভর্তি করতে।

পরিচিত প্রধান শিক্ষক প্রশ্ন করলেন, ভাইপোকে কোন ক্লাসে দিতে চান হরিহরবাবু?

ভাবছি, ক্লাস সেভেনে দেব। পর পর দুটো বছর জানুয়ারী মাসে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল বলে ওকে ভর্তি করতে পারি নি। এবার ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভালো আছে। এইটে আর দেব না, সেভেনেই ভালো।

প্রধান শিক্ষক ছোটখাটো গোবেচারা চেহারার মধুসূদনের দিকে তাকিয়ে বললেন, ক্লাশ সেভেন কি ও পারবে? ওকে বরং ফোরে দিয়ে দিন।

হরিহরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, ফোরে! কি বলছেন মশাই!

উচু ক্লাশে সিলেবাস শক্ত, আপনার ভাইপোর পক্ষে—

পরীক্ষা নিয়ে দেখুন না? সিলেবাস যে শক্ত, তা কি আমি

জানি না ? পেরে যদি না ওঠে, নিচু ক্লাশে দেবেন।

পরীক্ষা নেওয়া হল।

গোবেচারা ছেলেটির জ্ঞান-বুদ্ধি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন প্রধান শিক্ষক। ওকে ক্লাশ সেভেনে ভর্তি করতে আর কোন বাধা রইল না। বলা বাহুল্য, এই স্কুল থেকেই সসম্মানে প্রথম বিভাগে ও ম্যাট্রিকের দরজা অতিক্রম করেছিল।

তারপর ধাপে ধাপে উঠে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে নিজের পাঠ-জীবন শেষ করল মধু। কাকা তখন বেঁচে নেই। দীর্ঘ রোগভোগের পর দেহ রেখেছেন। কাকার মৃত্যুর পর নিজের বলতে মধুর দুনিয়ায় আর কেউ রইল না।

মুক্তপুরুষ। আর্থিক অবস্থা ভালোই—বাপ-কাকা অনেক রেখে গেছেন। বসে খেলে রাজার হালে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু মধু স্থির করে ফেলেছে ওইভাবে জীবন কাটাবে না। সে জানে, আইডল্ ব্রেন ইজ দি ডেভিল্স্ ওয়ার্কসপ। সে চাকরি করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ডিগ্রী যখন তার পৃষ্ঠপোষক, তখন চাকরির অভাব হবে না!

অনেক বাছাবাছির পর মধু অধ্যাপনার কাজ বেছে নিল। সহকর্মীরা সকলেই পরিচিত। শ্রদ্ধেয়। এই কলেজেই সে চার বছর পড়াশুনা করেছিল। প্রথমে বাঁধোবাঁধো ঠেকতো; যাঁরা তাকে পড়িয়েছেন, তাঁদের পাশাপাশি বসতে কুণ্ঠা বোধ করত। কুণ্ঠাকে শেষ পর্যন্ত জয় করতে হল। জয় করতে না পারলে, কলেজ ছেড়ে দেওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না।

দিন ভালোভাবেই কেটে চলেছে। এইরকম গতানুগতিকভাবে দিন কেটে যাবে, এ-ধারণা করে নেওয়া ভুল। এই ভুল ধারণার মধ্যেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল মধু। সে ভেবেছিল, এই তো জীবন! দায় নেই, দায়িত্ব নেই—প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন কি চমৎকারভাবেই না কেটে যাবে!

কাটল না ওইভাবে দিন। শেষ পর্যন্ত মধুকে গার্হস্থ্য জীবনে

প্রবেশ করতে হল, নিতে হল দায়, দায়িত্ব। জীবনেয় মোড় এইভাবে সে স্বেচ্ছায় নিতে চায় নি। তার মনোভাব একদিন এলোমেলো করে দিলেন সংস্কৃতর অধ্যাপক তর্করত্ন মশাই।

নীলকণ্ঠ তর্করত্নর অগাধ পাণ্ডিত্য সংস্কৃত সাহিত্যে। প্রায় বিশ বছর অধ্যাপনা করছেন। শুষ্ক, একহারা চেহারা। চুল ছোট করে ছাঁটা, তবে টিকিটি পুরুষ্ট। ছাত্র মহলে মিষ্টভাষী ও রসিক হিসেবে তাঁর সুনাম আছে।

ছাত্র-জীবনে মধুর পাঠ্য-সূচীতে সংস্কৃত ছিল না, কাজেই তর্করত্ন মশাইয়ের কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করবার সুযোগ তার হয় নি। তবে তাঁকে সে শ্রদ্ধা করত, এবং এখনও করে। এই কলেজেই মধুকে অধ্যাপকের পদ নিয়ে আসতে দেখে তিনি সবিশেষ আনন্দিত হয়েছিলেন।

সেদিন ছুটোর পর মধুর কোন ক্লাশ ছিল না, কলেজে আর সময় নষ্ট না করে বাড়ি ফিরে যাওয়া মনস্থ করল। এই সময় বাড়ি ফিরলে কিছু পড়াশুনার অবকাশ পাওয়া যায়। কলেজ থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দেবার পরই লক্ষ্য করল, তর্করত্ন মশাই বাসস্টপের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

মধু এগিয়ে গিয়ে বলল, আপনিও বাড়ি ফিরছেন স্যার?

হাসি-মুখে তর্করত্ন বললেন, হ্যাঁ। আজ আর কোন ক্লাশ নেই, এখন বাড়ি ফিরলে বেশ কিছুক্ষণ লেখা যাবে।

আপনার 'সংস্কৃত সাহিত্যের মূলকথা' শেষ হতে আর কত দেরি স্যার?

মাস ছয়েক তো আরো লাগবেই। ওহে গুপ্ত—

আজ্ঞে—

এখন তো তুমি আমার কলিগ হে। স্যার, স্যার, করে অস্থির হও কেন বলতো?

মৃদু হেসে মধু বলল, আমার সৌভাগ্য স্যার, আমি আপনাদের ছায়ায় এখনও আছি। অতীতের সম্পর্ক থেকে আমায় বঞ্চিত

করবেন না।

প্রশংসার দৃষ্টিতে মধুর দিকে তাকিয়ে তর্করত্ন বললেন, আমার দুর্ভাগ্য সংস্কৃতর ছাত্র-হিসাবে আমি তোমাকে কাছে পেলাম না। বাড়ি ফিরছো নাকি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ ; আমারও ক্লাশ নেই।

দাঁড়িয়ে আছি এখানে মিনিট কুড়িকের কম হবে না, বাসের দেখা নেই !

এই রুট খুব নেগলেক্‌টেড। একটা ট্যাক্সি আসছে স্যার, ওটা বরং থামানো যাক।

তোমার প্রস্তাব মন্দ নয়, একই পথে যখন যেতে হবে।

ট্যাক্সি থামানো হল। মধু ও তর্করত্ন উঠে বসলেন। তিনি বললেন, বাসের জন্য কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হত বলা ভগবানের অসাধ্য, তার ওপর ভিড়ের সম্ভাবনা তো ছিলই। এই ভালো।

ট্যাক্সি এগিয়ে চলল। নানা রকম কথা হতে লাগল দুজনের মধ্যে। এক সময় তর্করত্ন বললেন, ওহে গুপ্ত, একটি প্রশ্ন তোমাকে করবার ইচ্ছা আমার বহু দিনের।

বলুন স্যার ?

তুমি এখনও দারপরিগ্রহ করছ না কেন বলতো ? আমি যতদূর জানি, তোমার আর্থিক অবস্থা আশানুরূপ। অন্যান্য কোন অসুবিধাও নেই।

মধু প্রবীণ অধ্যাপকের প্রশ্নে বিব্রত হল।—আজ্ঞে…

না, না, তোমাকে বাধ্য করছি না। বলতে অসুবিধা থাকলে, আমার প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই।

বলতে অসুবিধা নেই স্যার ; আসল কথা হল, বিয়েতে আমার রুচি নেই।

চোখ কপালে তুললেন নীলকণ্ঠ তর্করত্ন।—বল কি হে, রুচি নেই ! আজকালকার ছেলেদের এই ধরনের বিকারকে প্রশ্রয় দিতে দেখছি বটে। তুমি বলতে চাও, তোমার বাপ-ঠাকুর্দা বিবাহ করে

কুরুচির পরিচয় দিয়েছিলেন ?

আজ্ঞে না ; আমি সেকথা বলতে চাই নি স্যার। আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল—

উদ্দেশ্য যাই থাক, মহৎ নয়। আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী। আমার উপদেশ শোন, বিবাহাদি করে সংসারধর্ম পালন করো।

মধু কিছু বলল না। তার মনে হতে লাগল, একান্তে এঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ না হলেই ভালো ছিল।

তর্করত্ন আবার বললেন, মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল তার যৌবন। সেই যৌবন তুমি হেলায় নষ্ট করছ। পরে পরিতাপ করবে গুপ্ত।

আপনার কথাটা আমি ভেবে দেখব স্যার।

নিশ্চয় ভেবে দেখবে! আমার কথাবার্তায় তুমি ক্ষুণ্ণ হলে না তো ?

না, না—

যাক, এসে পড়েছি। ড্রাইভার, গাড়ি থামাও!

তর্করত্ন নেমে গেলেন। ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরল মধু।

পড়াশোনায় মন বসল না। থেকে থেকে তর্করত্ন মশাইয়ের কথাগুলি মনে পড়তে লাগল। তিনি যা বলেছেন, তাকে স্নেহ করেন বলেই বলেছেন। তাছাড়া খুব মন্দ হয় না—এই যে কলেজ থেকে ফিরে এসেছে, একা পড়ে আছে বাড়িতে, সঙ্গ দেবার কেউ নেই! দুটো কথা বলে মনকে হাল্কা করবার মত কেউ নেই! অসুস্থ হয়ে পড়লে আন্তরিকভাবে সেবা করবার কেউ নেই!

স্ত্রী থাকলে এতগুলো অসুবিধার মুখোমুখি কি দাঁড়াতে হত ?

বিয়ে করলে ক্ষতি কি ?

তর্করত্ন মশাই ঠিকই বলেছেন, হেলায় যৌবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সত্যিই তো যৌবনকে এই ভাবে নষ্ট করবার অধিকার তো তার নেই! অনেক রাত পর্যন্ত মধু চিন্তা করল। বলতে গেলে পরের দিনও চিন্তার মধ্যে কাটল।

তৃতীয় দিন সে স্থির করে ফেলল বিয়ে করবে।

কলেজে পৌঁছে তর্করত্ন মশাইকে বলল, স্যার আপনার কথা আমি গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখলাম—বিয়ে আমার করা উচিত।

নীলকণ্ঠ তর্করত্ন খুশি হলেন।

তোমার সুবুদ্ধি হয়েছে, সুখের কথা। দেখে-শুনে এবার সুলক্ষণা একটি মেয়ে ঘরে আনো!

মৃদু হেসে মধু বলল, আমি কোথয়ে মেয়ে দেখতে যাব? ও-কাজ আপনার। আমি শুধু বিয়ের পিঁড়িতে সময় মত উপস্থিত থাকতে চাই।

তুমি তো খুব চতুর ছোকরা, দায়িত্বপূর্ণ কাজটি আমার স্কন্ধে চাপাতে চাও! অবশ্য দায়িত্ব গ্রহণ করতে জীবনে পশ্চাৎপদ হই নি। সন্ধানে রইলাম।

শুভ লগ্নে বিয়ে হয়ে গেল একদিন।

পাত্রীটি তর্করত্নমশাইয়ের এক ছাত্রর মেয়ে। মেয়েটি ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করেছে। আহা মরি না হলেও দেখতে-শুনতে মন্দ নয়। মধুর অপছন্দ হল না।

বিয়ের পর তার দিনগুলি চমৎকারভাবে কাটতে লাগল; মাঝে একবার ঘুরে এলো পুরী।

মধুর যাবার ইচ্ছে ছিল অন্য কোথাও। সুনন্দার ইচ্ছে সমুদ্র দেখার। স্ত্রীর মতে মত দিয়ে ঘুরে আসতে হল পুরী। ওখানে দিন দশেক কেটে গেল অচীন মুর্ছনার মধ্যে দিয়ে।

কবির কথা নয়, সত্যি সময় কারুর জন্যে অপেক্ষা করে না। দেখতে দেখতে মধুর বিয়ের পর মাস আষ্টেক কেটে গেল। কলেজ থেকে সবে ফিরছে মধু, অন্যান্য দিনের মত আজ কিন্তু সুনন্দা তাকে হাসি মুখে অভ্যর্থনা করল না, দরজা খুলে দিয়ে বসল গিয়ে হেলান দেওয়া চেয়ারে।

মধু ওর মুখের দিকে তাকাল। কেমন যেন শুকনো শুকনো লাগছে।

নন্দা, তোমার শরীর খারাপ ?

অন্য ধারে মুখ ফিরিয়ে সুনন্দা বলল, না।

তোমাকে শুকনো দেখাচ্ছে কেন ? নিশ্চয় শরীর খারাপ হয়েছে !

না···মানে···

মধু স্ত্রীর পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল মাটিতে।

কি হয়েছে নন্দা ? লুকিও না, আমায় বলো···

মধু দেখতে পেলো সুনন্দার মুখে ক্রমেই আবিরের প্রলেপ পড়ছে।

তোমাকে আগেই বলা উচিত ছিল ; কিন্তু চেষ্টা করেও বলতে পারি নি। আমি···মানে·· আমার···

বলো, বলো, তোমার কি ?

আমরা বোধ হয়···

থেমে যাচ্ছো কেন, বলো না !

আমরা বোধ হয় আর দুজন থাকছি না—

মধু সবিস্ময়ে বলল, কেন, আমরা দুজন থাকছি না কেন ?

আমরা কয়েক মাস পরে তিনজন হয়ে যাচ্ছি !

অ্যাঁ···কি বললে নন্দা ? আমরা····মানে···আমাদের···

অসহ্য আনন্দে মধু সবলে জড়িয়ে ধরল সুনন্দাকে।

তুমি কিভাবে বুঝলে ?

স্বামীর বুকে মুখ রেখেই সুনন্দা বলল, তোমার যেমন কথা ! তিন মাস ধরে শরীরের মধ্যে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসছে বুঝতে পারব না ?

মধু উঠে পড়ল, এগিয়ে চলল দরজার দিকে।

কোথায় যাচ্ছো ?

ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।

ছেলেমানুষী করো না। ডাক্তারের যখন প্রয়োজন হবে, আমি নিজেই তোমাকে বলব। এসো আমার কাছে।

সুনন্দার কাছে এসে বসল মধু। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে

বলল, আমাদের কি হবে বলো তো ?

ছেলে।

না, মেয়ে।

মেয়ে কেন ? তুমি ছেলে পছন্দ করো না ?

আমার মেয়েই ভালো। ছেলেরা বাপেদের কাছে ঘেঁষতে চায় না, তাদের সব ভালোবাসা মায়েদের প্রতি।

সুনন্দা হাসতে হাসতে বলল, তুমি বাপু ভীষণ স্বার্থপর !

মধুও হাসল।

পৃথিবীতে কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। মানুষের জীবনের আনন্দও না। মধুর ভাগ্যের এককোণেও ঝড় উঠব-উঠব করছিল, সে বুঝতে পারে নি। তার ধারণা ছিল, হেসে-খেলে আনন্দে বুঝি-বা জীবন কেটে যাবে।

ঝড় উঠল একদিন। ঝড়ের তাণ্ডব সমস্ত কিছুকে লণ্ডভণ্ড করে চলে গেল।

ঝড়ের পর ভগ্নস্তূপের ওপর যখন মধু দাঁড়িয়ে রয়েছে, তখন তার পাশে সুনন্দা নেই। কোনদিন এসে দাঁড়াবেও না। আচম্বিতে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেছে অন্য লোকে। এরকম যে হবে ডাক্তাররাও বুঝতে পারেন নি। বরং পেসেন্টের সুস্থতা ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে বলে তাঁদের ধারণা হয়েছিল।

সিজারিয়ান অপারেশনের পর বাচ্চার জন্ম দিয়েছিল সুনন্দা। তখন সময়োচিত অসুস্থতা ছাড়া আর কোন উপসর্গ দেখা দেয় নি। মাসখানেক ভালোই কাটল। অনেক রঙীন স্বপ্ন দেখল দুজনে।

একদিন সুনন্দা বলল, তোমার কথাই শুনলেন ঠাকুর।

কোন্ কথা ?

মেয়ে হল যে !

মধু হেসে বলল, তাতে কি হয়েছে ! আজকালকার মেয়ে ও ছেলের মধ্যে তফাৎটা কি বলো না ? তুমি না হয় তোমার মেয়েকে

ছেলের মতই মানুষ করো।

হঠাৎ একদিন মাঝরাত্রে সুনন্দার শরীর খারাপের দিকে মোড় নিল।

ডাক্তারদের হাট বসিয়ে দিল মধু। অর্থ জলের মত ব্যয় হতে লাগল। চিকিৎসায় নিষ্ঠার অভাব ছিল না। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না; মধুর বুক খালি করে সুনন্দা চলে গেল। একফোঁটাও চোখের জল পড়ল না তার। শোকে পাথর হয়ে যাওয়া একেই বলে বোধ হয়। এক মাসের মেয়েকে বুকে আঁকড়ে মৃতা স্ত্রীর মুখের দিকে নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

সুনন্দার মৃত্যুর পর দশ দিন অতিক্রম করেছে।

নবজাতককে নিয়ে অসম্ভব অসুবিধার মধ্যে আছে মধু। প্রতি-বেশী মহিলারা প্রথম কয়েকদিন বাচ্চার দেখা-শুনা করেছিলেন। নিজেদের ঘর-সংসারের কাজ-কর্ম ফেলে তাঁরা আর কতদিন পরের ঝক্কি সামলাবেন।

মধুর আতান্তরের সীমা নেই। বচ্চাকে সামলাতে পারছে না। সামলাতে পারার কথাও নয়। বাচ্চারই বা অপরাধ কি? স্বাভাবিক নিয়মে সে নিজের মাকে খুঁজবে। সে তো জানবে না, তার জন্ম তার মায়ের মৃত্যুকে ডেকে এনেছে।

বাচ্চার কান্নায় অস্থির মধুর দৃষ্টি পড়ল, ড্রেসিং টেবিলের ওপর টাঙানো সুনন্দার বিরাট পোর্ট্রেটের দিকে। সে দ্রুতপায়ে গিয়ে দাঁড়াল সেখানে।

বাষ্পরুদ্ধ গলায় বলল, তুমি এইভাবে আমার সর্বনাশ কেন করলে নন্দা? তোমার এই উপহারকে সামলাবার সাধ্য কি আমার আছে? আমি বেঁচেও মরে আছি। তুমি আমার শুধু সর্বনাশ কর নি, তুমি আমাকে খুন করেছ। আমার স্বত্বা, আমার ভবিষ্যতকে নির্মমভাবে গলা টিপে মেরে রেখে গেছ!

দরজায় কে করাঘাত করল।

সুনন্দার পোর্ট্রেটের কাছ থেকে সরে এল মধু। দরজা খুলে দিল।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নীলকণ্ঠ তর্করত্ন। বিষন্ন তাঁর মুখ। তিনি ধীরকণ্ঠে বললেন, মধুসূদন—

স্যার আপনি এসেছেন—

আসা আমার সেইদিনই উচিত ছিল, কিন্তু আসতে পারি নি। বারংবার মনে হয়েছে এই বিয়োগান্ত ঘটনার জন্য দায়ী আমি। আমার কথামতই তুমি···, তিনি কথা শেষ করলেন না।

আর নিজেকে সংযত করতে পারল না মধু, দশ দিনের রুদ্ধ চোখের জল অজস্র ধারায় গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে. ক্ষীণ, তীক্ষ্ণ গলায় তখন নবজাতক কেঁদে চলেছে।

সান্ত্বনা জানাবার ভাষা আমার নেই বাবা। ঘর বাঁধবার পরামর্শ দেবার সময় বুঝতে পারি নি আমি তোমার ঘর ভেঙে দিচ্ছি।

মধু নিজেকে সামলাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে বলল, আপনি সঙ্কুচিত হবেন না স্যার, এ আমার ভাগ্যের দোষ। সুনন্দাকে ধরে রাখবার চেষ্টা কম আমি করি নি—ভাগ্যের সঙ্গে পেরে উঠব কেন।

তর্করত্ন ভিতরে এলেন। অনেক কথা হল দুজনের মধ্যে।

কথায় কথায় উনি বললেন, এইভাবে চলতে থাকলে তুমি তো কোনদিন কলেজ যেতে পারবে না।

কিভাবে যাব বলুন? বাচ্চাটাকে কার কাছে রেখে যাব?

কোন মহিলা নিজের লোক তোমার নেই? তাঁকে আনিয়ে নাও। সত্যি কথা বলতে কি, তুমিও যে বাচ্চাকে সামলাতে পারছ, তা তো নয়।

দেখি···।

এক সময় তর্করত্ন মশাই বিদায় নিলেন। মধু চিন্তা করে দেখল, তিনি মন্দ কথা বলেন নি। একজন আত্মীয়াকে নিজের কাছে এনে না রাখলে বাচ্চাকে বাঁচানো যাবে না, তার পক্ষেও কাজকর্মে যোগ দেওয়া সহজ হবে না।

প্রশ্ন দেখা দিল কাকে আনা যায়। নিজের সংসারের বিষয় ভ্রূক্ষেপ না করে কে তার সংসারের বোঝা হাসি-মুখে বইবে? প্রথমে চিন্তার সমুদ্রে থৈ পাওয়া গেল না, শেষে ডাঙ্গার সন্ধান পাওয়া গেল। মনে পড়ে গেল লাবণ্যদির কথা। লাবণ্যদি দূর সম্পর্কের পিসতুতো দিদি হল মধুর। বিধবা হয়েছেন বিয়ে হবার মাত্র তিন বছর পরে। এখনও তিনি চল্লিশের কোঠা পার হন নি। থাকেন বিরাটিতে।

কোন ঝক্কি-ঝামেলা তাঁর নেই। পান খান আর পাড়া বেড়িয়ে সময় কাটান। কলকাতার দূরত্ব মাত্র ন'মাইল। মাঝে মাঝে আসেন এখানে। সিনেমা দেখে বিরাটিতে ফিরে যান। মধুর দৃঢ় ধারণা হল, তিনি সানন্দে এই বিপদে তাকে সাহায্য করবেন।

সংবাদ পাঠান হল।

লাবণ্যদি এলেন। আঁটসাঁট চেহারা তাঁর। গায়ের রঙ মাজা-মাজা। কাঁচা বয়সে চেহারায় চটক ছিল, এখন দেখেও বুঝতে পারা যায়। তিনি সমস্ত শুনে অমত করলেন না। বাচ্চাকে তুলে নিলেন বুকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মধু।

লাবণ্যদি বাড়িতে আসার দিন দুয়েক পর থেকেই মধু কলেজ যাওয়া আসা আরম্ভ করল। বাচ্চাও বলিষ্ঠ আশ্রয় পেয়ে নিজেকে সামলে নিয়েছে বলা চলে। মাস খানেক কেটে গেল ক্রমে। সুনন্দার ঘা বুকের মধ্যে দগদগে থাকলেও, অনেক নিশ্চিন্ত এখন মধু।

সেদিন একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল। ইচ্ছে ছিল নিজে বাড়িতে থেকে লাবণ্যদিকে সিনেমা দেখতে পাঠাবে। এখানে এসে অবধি তিনি ওপথ মাড়াবার সুযোগ পান নি। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল। মধু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল, লাবণ্যদি দরজা খুলে দিতে আসেন নি। দরজা খুলে দিল একজন সুন্দরী তরুণী!

মধু কিছু না বলে এগিয়ে গেল। ভিতরের বারান্দায় লাবণ্যদির সঙ্গে সাক্ষাত হতে সে সাগ্রহে প্রশ্ন করল, মেয়েটি কে?

রেবা।

তোমার কেউ হয় নাকি?

আমার আবার কে হবে? শোভাবাজারে সেজমাসীর বাড়ির পাশে ওরা থাকে। খুব আলাপ আছে। বেশ মেয়ে রেবা। তারপর কৈফিয়তের সুরে তিনি বললেন, রিলি ঘুমিয়ে পড়লে কিছু করার থাকে না, দীর্ঘ দুপুরে একা একা হাঁপিয়ে উঠি। রেবাকে বলেছিলাম। ও আসে মাঝে মাঝে। কথায় কথায় সময় কেটে যায়।

লাবণ্যদি মধুর মেয়ের নাম দিয়েছেন মরালী। ছোট করে রিলি বলে ডাকা হয়।

মধু বলল, ভালোই করেছ তো। উনি আসেন, কথায়-বার্তায় সময় কেটে যায়—ভালোই।

সে নিজের ঘরে চলে গেল।

রেবার সঙ্গে আরো কয়েকবার দেখা হয়েছে মধুর। যেদিন লিজার থাকায় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছে, দেখা হয়েছে সেদিনই। কথা হয় নি। দু-একটা কথা বলার ইচ্ছে যে তার হয় নি তা নয়। তবে কেন জানি না, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কিছু বলে নি।

হঠাৎ একদিন অনিবার্য কারণে দুজনের কিছু কথাবার্তা হয়ে গেল। তিনটের কিছু পরে মধু বাড়ি ফিরেছিল। কড়া নাড়ার পর যথা নিয়মে দরজা খুলে দিল রেবা। বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে সে কিন্তু লাবণ্যদিকে দেখতে পেল না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রেবার দিকে না তাকিয়ে তখন উপায় ছিল না। রিলি অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

রেবা মৃদু গলায় বলল, উনি বেরিয়েছেন।

কোথায় গেছেন?

বিরাটি থেকে কয়েকজন কিছুক্ষণ আগে এসেছিলেন। উনি সিনেমা গেছেন। পৌনে ছ'টার মধ্যে এসে পড়বেন।

ও।

মধু নিজের ঘরে চলে গেল।

মিনিট দশেক অতিক্রম করেছে, রেবা এসে দাঁড়াল পর্দা সরিয়ে।

কিছু বলবেন?

চা খাবেন কি ?

চা !

লাবণ্যদি বলে গেছেন আপনাকে চা করে দেবার কথা।

চায়ের দরকার নেই। আপনার কষ্ট হবে।

রেবা একটু হেসে বলল, এক কাপ চা করতে আমার কষ্ট হবে না।

এক কাপ কেন! আপনি খাবেন না ?

এই সময় আমি চা খাই না।

এবার মধুর হাসার পালা ; হেসে বলল, আমাদের দেশে চা খাবার কোন সময় নেই, খেলেই হল। এক কাপ নয়, দু-কাপ তৈরী করবেন।

রেবা চা তৈরী করতে গেল।

মাস দুয়েক আরো কেটেছে।

লাবণ্যদি বললেন, আমাকে দিন দুয়েকের জন্য বিরাটি যেতে হবে ভাই।

মধু প্রমাদ গুনলো, দু-দিনের জন্য ? কেন লাবণ্যদি ?

শ্বশুরের বাৎসরিক। না গেলেই নয়।

কিন্তু···

ওই দেখ, ছেলের মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল। আমি কতদিন বাঁধা পড়ে থাকব এখানে ? এখন না হয় দু-দিনের জন্য যাচ্ছি, সামনের পুরো মাসটাই ছেড়ে দিতে হবে। ন'মাসীকে কথা দিয়েছি, তাঁর সঙ্গে কেদার-বদ্রী যাব।

সর্বনাশ। রিলির কি হবে তাহলে ?

তুই আমাকে ধরে রাখতে চাইলে হবে কেন ? পরকালের চিন্তা এখন থেকে যদি না করি, কখন করব বল ? আমার একটা কথা শোন, তাহলে সব দিক রক্ষা পায়।

বলো ?

বিয়ে কর।

বিয়ে করব ! কি বলছ লাবণ্যদি ?

ঠিকই বলছি। তোরও দেখা-শুনা করবার লোক আসবে, রিলিও বাঁচবে।

একবার তো বিয়ে করেছিলাম। দেখলে তো, ধাতে সইল না।

ভাগ্যবানের বৌ মরে বুঝলি। মেয়েটা না থাকলে তোকে বিয়ে করতে বলতাম না। ওই অবোধ শিশুর জন্য তোর অনেক দায়দায়িত্ব, স্বার্থত্যাগ করতে হবে। আমার কথাটা ভেবে দেখ।

ও কথা থাক ; এখন যে তুমি দিন দুয়েক থাকবে না, তার কি হবে ?

তুই কলেজে থাকাকালীন রেবা রিলিকে দেখবে। রাত্তিরটুকু শুধু তার কষ্ট।

বিস্ময়ের শেষপ্রান্তে পৌছল মধু ঃ বলছ কি লাবণ্যদি ! তোমার অনুপস্থিতির সময় উনি রিলিকে দেখবেন ?

আমি ওকে বলে রেখেছি।

কিন্তু···ভালো দেখাবে কি ?

খারাপ দেখাবার কি আছে ?

তুমি বুঝতে পারছ না, উনি একজন অবিবাহিত মহিলা। মানে···

থাক, তোকে আর কথা বাড়াতে হবে না। বিশ্বাসের অমর্যাদা তুই করবি না জানি। আমি যা বলেছি, মাথা ঠাণ্ডা করে দেখ, তাহলে সব দিক রক্ষা পায়। রেবার মত মেয়ে হয় না।

রেবা ! লাবণ্যদি···

আমি তোর ভালো চাই মধু।

না-না ; এ হতে পারে না, এ হবার নয় লাবণ্যদি।.

নিজের পায়ে যারা কুড়ুল মারে, আমি তাদের ঘৃণা করি। তুই রিলিকে মেরে ফেলতে চাস ? একটু ভেবে দেখ, রেবা ওর জন্যে জীবন দিতে পারে।

আর বোলো না। তুমি থামো···তুমি থামো লাবণ্যদি। আমি কিছু ভাবতে পারছি না, সমস্ত গোলামাল হয়ে যাচ্ছে।

মধু ছুটে পালিয়ে গেল নিজের ঘরে।

সেদিনকার মত নিষ্কৃতি পেলেও বরাবরের জন্য নয়। লাবণ্যপ্রভা লেগে রইলেন মধুর পিছনে। দ্বিতীয়বার বিয়ে না করলে রিলিকে বাঁচানো যাবে না, একথা বারংবার বলে তাকে অতিষ্ঠ করে তুললেন।

উপায়হীন মধুকে শেষপর্যন্ত বলতে হল, বেশ, তোমার কথা রাখব। কিন্তু রেবার বাবা কি দ্বিতীয় পক্ষর হাতে মেয়ে দিতে রাজি হবেন?

হবেন বৈকি। না হলে আমি তাঁকে রাজি করাব।

লাবণ্যপ্রভা নিজের কথা রাখলো। কেদার-বদ্রী যাবার পূর্বে রেবার সঙ্গে মধুর বিয়ের ব্যবস্থা করালেন। অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুভকাজ শেষ হল। তর্করত্ন মশাই ছাড়া নিজের সহকর্মীদের কাউকে মধু আমন্ত্রণ জানায় নি।

বিদায় নেবার সময় তিনি দুজনকে আন্তরিকভাবে আশীর্বাদ করে গেছেন। রেবা ও মধুকে বৌভাতের দিন একান্তে রেখে রিলিকে কোলে নিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে লাবণ্যপ্রভা যখন ঘরের বাইরে এসেছেন, তখন সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে।

মধু প্রথমে কিছু বলতে পারে নি। সুনন্দার পোর্ট্রেটের দিকে তাকিয়ে বসে থেকেছে অনেকক্ষণ। রেবা নববধূ, কি বলবে, সেও চুপচাপ। এখনও কোন বাড়িতে শানাই বাজছে। দুটি জীবন নতুন জীবনে প্রবেশ করছে সেখানে আর এখানে, একজন নতুনকে সাগ্রহে গ্রহণ করবার জন্য উন্মুখ কিনা কে জানে। দ্বিতীয়জন, বেদনাদগ্ধ যে-জীবন ফেলে এসেছে, সেই স্মৃতিকে রোমন্থন করবার জন্য হয়তো ব্যগ্র!

একসময় মধু নীরবতা ভঙ্গ করল।

রেবা···

বলুন?

তোমার জীবনের অনেক আনন্দকে আমি নষ্ট করে দিলাম।

এ-কথা কেন বলছেন?

বয়স আমার যাই হোক না কেন, দ্বিতীয়বার বিয়ে করলাম। আর রিলি—বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে গুরুদায়িত্ব তোমাকে নুইয়ে দিয়েছে।

রেবা কিছু বলল না।

নীরবতার মধ্যে দিয়ে মিনিট কয়েক আরো কাটল।

তারপর মধু বলল, গোটা কতক কথা তোমাকে বলে নিতে পারলে ভালো হত। কিন্তু থাক—ফুলশয্যার রাতের একটা স্বতন্ত্র মাদকতা আছে। আমার জীবনে না হয় দ্বিতীয়বার, তোমার তো প্রথম। স্বাভাবিক নিয়মে কিছু অর্থহীন কথা আমরা এখন আলোচনা করব।

রেবা মৃদু গলায় বলল, আপনি যা বলতে চাইছিলেন, বলুন?

না, থাক।

মিথ্যা ভাবাবেগ আমার নেই। বলুন?

সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। তোমাকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে চাই, অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিয়ে আমাকে করতে হয়েছে। এ-কথা খুবই সত্যি, রিলি আমাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে বাধ্য করেছে। তোমার কাছে আমার এই প্রথম ও বিশেষ অনুরোধ, আমার ওপর তোমার কর্তব্য কিছু শিথিল হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু রিলিকে চোখের মণি করে রাখবে।

রিলির জন্য আপনি চিন্তিত হবেন না।

আমি বিশ্বাস করি রেবা, তুমি তাকে নিজের করে নিতে পারবে। আমার কি মনে হচ্ছে জান?

বলুন?

মনে হচ্ছে, সুনন্দা আমাদের দুজনের খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে শুনছে, আমরা তার রিলির সম্পর্কে কি আলোচনা করছি।

আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?

সুনন্দার আত্মাকে ভূত বলে হেয় কোরো না, সে আমার জীবনে ওয়েশিশ ছিল রেবা। যাক, ও-সমস্ত কথা। রাত অনেক হল, শুয়ে পড় এবার।

আপনি···

আমি একটা চিঠি লেখা শেষ করে শুতে আসছি।

বিয়ের পর মাস খানেক কেটে গেছে।

মধু রেবার কাছে জানতে চেয়েছিল দিন দশেকের ছুটি নেবে কিনা। রিলিকে নিয়ে দুজনে ঘুরে আসবে কোথাও। রেবা রাজি হয় নি। তার অভিমত হল, এখন সিজন চেঞ্জের সময়। কলকাতার বাইরে গেলে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে রিলি, এখন থাক। ও আরো কিছু বড় হোক। তারপর যেখানে ইচ্ছে যাওয়া যাবে। মন্দ যুক্তি নয়।

কলেজ থেকে ফিরে কাপড় বদলাতে বদলাতে মধু লক্ষ্য করল, ড্রেসিং টেবিলের পাশে টাঙানো সুনন্দার বড় পোর্ট্রেটটা যথাস্থানে নেই। কোথায় গেল! রেবা ঘরে ছিল না, রিলিকে নিয়ে বাগানে আছে বোধ হয়। ভেজানো দরজা ঠেলে বাড়িতে প্রবেশ করেছিল মধু।

রেবা—রেবা—

মধুর আহ্বানে রেবা ঘরে এল। অবাক হয়ে বলল, ওমা, তুমি কখন এলে?

মিনিট কয়েক হল। রিলি কোথায়?

পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে।

আচ্ছা, সুনন্দার ছবিটা এখান থেকে কোথায় গেল বলতো?

মুখ নামিয়ে রেবা বলল, আমি সরিয়ে রেখেছি।

কেন! সরিয়ে রেখেছ কেন?

ও-রকম জায়গায় কেউ ছবি টাঙিয়ে রাখে নাকি? আমার বিশ্রী লাগল। পরে বাইরের ঘরে টাঙিয়ে দিলেই হবে।

গম্ভীর গলায় মধু বলল, খুবই দুঃখের কথা, তুমি আমার বিবাহিত স্ত্রী অথচ আমার মনের খোঁজ রাখো না।

খোঁজ যদি না রাখব, তবে মানিয়ে চলছি কিভাবে?

যুক্তি দিয়ে সমস্ত কিছুকে প্রমাণ করা যায় না রেবা। অনুভূতি হল আরেক জিনিস। কাজটা তুমি ভালো করো নি।

রেবা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, এ-বাড়ির কর্ত্রী আমি অথচ দেওয়াল থেকে একটা ছবি সরিয়ে নেবার অধিকার পর্যন্ত নেই আমার। আগে জানা থাকলে নিশ্চয়ই ও কাজ করতাম না।

অবুঝ হবার চেষ্টা কোরো না। ছবিটা কোথায় রেখেছ দাও, আমি আবার যথাস্থানে টাঙিয়ে রাখতে চাই।

আছে কোথাও। রেবা দ্রুতপায়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

রেবার ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হল মধু। মনে হল, ও যেন জেনে-বুঝে তার নরম জায়গায় আঘাত করেছে। সে রেবাকে অনুসরণ না করে ছবিটির অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হল। খুঁজতে হল না বিশেষ, পাওয়া গেল ওয়ার্ডরোবের পিছন থেকে।

কাচ ফেটে গেছে। সুনন্দার সুন্দর মুখের ওপর ফাটা কাচের অসংখ্য দাগ রেখায়িত হয়ে রয়েছে। একটি মুহূর্তের অবহেলায় খান-খান হয়ে গেছে ছবিখানি। রাগে দুঃখে মধুর শরীর থেকে আগুনের হল্‌কা বেরুতে লাগল।

ছবি হাতে নিয়েই সে রান্নাঘরে উপস্থিত হল। রেবা চা তৈরি করছিল; আড়চোখে তাকাল। তারপর মধুর উপস্থিতিকে গ্রাহ্য না করেই স্টোভের ওপর থেকে কেটলি নামিয়ে, পেয়ালার লিকার ঢালতে লাগল।

মধু গম্ভীর গলায় বলল, ছবিটা শুধু দেওয়াল থেকে নামিয়ে নাও নি, কাচটাও ফাটিয়ে রেখেছ।

আমি কাচ ফাটাই নি।

নিজে থেকে কাচ ফেটেছে বলতে চাও?

উঁচু থেকে খুলে পড়ে গেলে কাচ তো ফাটবেই।

তুমি মিথ্যের আশ্রয় নিচ্ছ রেবা। একটু আগে বললে, ছবিটা খুলে নিয়েছ, এখন বলছ পড়ে গেছে।

ঝাঁঝাল গলায় রেবা বলল, যদি কাচটা ফাটিয়েই থাকি, কি

এমন লক্ষ টাকার ক্ষতি করে দিয়েছি। যে মরে গেছে—তার ফেলে যাওয়া সমস্ত কিছুর ওপর তোমার যখন এতই দুর্বলতা, তখন বিয়ে করেছিলে কেন? ছবি দেখে বাকি জীবন কাটিয়ে দিলেই তো পারতে!

রেবা! আমি···

থাক, থাক—আর সিনেমার নায়কের মত ঢং করতে হবে না।

তোমাকে কেন, বিয়ে আমি কাউকেই করতে চাই নি। লাবণ্যদির অসম্ভব জেদের জয় হয়েছে। শুধু রিলির জন্য···

স্বার্থপর। নিজের স্বার্থের জন্য আমার জীবন ব্যর্থ করে দিতে তোমার বিবেকে বাঁধল না? চোখে আঁচল দিয়ে রেবা কান্নায় ভেঙে পড়ল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে চলল, টাকার তোমার অভাব নেই, রিলিকে দেখবার জন্য গভর্নেস রাখলে তো পারতে, বিয়ে করবার কি দরকার ছিল?

পরিস্থিতি এমন নাটকীয় হয়ে উঠবে মধু কল্পনা করতে পারে নি। বিব্রত হয়ে পড়ল। মনে হতে লাগল, এই আলোচনাকে দীর্ঘ না করলেই ভালো হত। রেবার কাছে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, আমায় ভুল বুঝো না, তুমি আমার জায়গায় থাকলে, আমি এখন যা বলছি, তুমিও তাই বলতে। যেতে দাও ও-কথা। রেবা···

রেবা কিছু বলল না।

রাগ করে থাকলে তোমাকে কিন্তু অদ্ভুত সুন্দর দেখায়।

খোসামোদ করতে হবে না।

মধু হেসে ফেলল। বলল, পাড়ার রমেনবাবুর মেয়েকে কিন্তু আমি খোসামোদ করছি না, সময় বিশেষে নিজের স্ত্রীকে খোসামোদ করার অধিকার আমার নেই নাকি?

বিনয়ের অবতার।

কলেজের মেয়েরা আমায় কি বলে জান? অবশ্য আড়াল-আবডাল থেকে শোনা—তারা বলে, লোকটার ভাগ্য দেখেছিস, দুবার বিয়ে করল, আর দুবারই বৌ পেয়েছে পদ্মিনীর মত।

আর ছেলেরা কি বলে ?

তারা আমায় হিংসে করে।

রেবা হাসল।

মধু স্থির করে ফেলল সুনন্দার ব্যাপার নিয়ে ভবিষ্যতে এমন আর কোন কথা বলবে না, যাতে বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হতে পারে। ওই সমস্ত বিষয় তার কাছে যত গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, রেবার কাছে অতি তুচ্ছ ছাড়া কিছুই নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সপত্নী পাশে থাক বা না থাক, তাকে ঘৃণা করা হল স্বাভাবিক ধর্ম।

রেবাকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণে অকারণে সুনন্দার প্রশংসা করে থাকে মধু। স্বাভাবিক ভাবেই রেবার তা ভালো লাগে নি। মনের মধ্যে প্রচুর তুলনামূলক ভাব আনাগোনা করেছে, শেষে রাজ্যের আক্রোশ গিয়ে পড়েছে সুনন্দার পোর্ট্রেটটার ওপর।

সুনন্দার কথা আর তুলবে না মধু, সংসারে অশান্তিকে আমন্ত্রণ করে লাভ নেই।

মাস দুয়েক কেটে গেছে আরো।

রিলির স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না। ওই বয়সের বাচ্চার যেমন স্বভাব হওয়া উচিত তেমন নয়। নাম-করা ডাক্তারকে কল দিয়েছিল মধু। তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন, বিশেষ কোন রোগ নেই—পুষ্টির অভাবে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

পুষ্টির অভাবে !! মধু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে। পুষ্টির অভাব তো হবার কথা নয়। বিশেষজ্ঞদের অভিমত নিয়ে ওই বয়সের শিশুর পক্ষে যা কিছু প্রয়োজন সমস্তই সংগ্রহ করে বাড়ি ভরিয়ে রেখেছে, তবে কেন পুষ্টির অভাবে রিলি দিন দিন দুর্বল হয়ে যাবে ?

ডাক্তার চলে যাবার পর মধু তাকিয়েছে রেবার মুখের দিকে।

রেবা দ্বিধা জড়িত গলায় বলেছে, সময় মত ঠিক ঠিক তো সব খাইয়ে যাওয়া হচ্ছে। কেন যে ও দুর্বল হয়ে পড়ছে ভগবান জানেন।

আমি বরং দু-মাসের ছুটি নিই। কলকাতার বাইরে কোথাও

হাওয়া বদল করে এলে ও শরীরে বল পেতে পারে।

না, না, ও-কাজ কোরো না, হিতে বিপরীত হতে পারে। ঠাণ্ডা লেগে ব্রঙ্কাইটিশ কি নিউমোনিয়া হলে আর দেখতে হবে না। তার চেয়ে আমি বলি কি, মাদুলির ব্যবস্থা করি। তুকতাক বাচ্চাদের বেশ খাপ খায়।

মাদুলি!

তুমি ও-সমস্ত বিশ্বাস কর না নাকি?

আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু যায়-আসে না রেবা। মাদুলি পরালে যদি রিলির ভালো হয়, তবে পরাও।

মাদুলি পরানো হল রিলিকে।

মধুর মনে হল, মাদুলি পরার পর রিলি একটু ভালোর দিকে। একেবারে স্বাভাবিক হয়ে গেলে রেবা একটা কাজের মত কাজ করেছে বলতেই হবে। মধু অনেকটা নিশ্চিন্ত হল।

বিশেষ কারণ এসে পড়ায় কর্তৃপক্ষের অনুরোধে মধুকে আজকাল গোটা কয়েক বেশি ক্লাস নিতে হয়। আগেকার মত এখন সপ্তাহে দু-তিন দিন লিজার থাকার দরুণ দুপুরে বাড়ি চলে আসতে পারে না, ফিরতে পাঁচটা বেজে যায়।

কলেজ আজ বন্ধ হয়ে গেল বারোটার সময়। কলেজের সেক্রেটারি হঠাৎ মারা যাওয়ায় এ বন্ধ। মধু বাড়ি ফিরে এল। দরজার গোড়ায় পৌঁছে তাকে এক বিস্ময়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে হল। তালা ঝুলছে—অর্থাৎ রেবা কোথাও বেরিয়েছে।

পর মুহূর্তে খুব অস্বাভাবিক কিছু মনে হল না মধুর। প্রতিদিন একা বাড়িতে দুপুর কাটানো কষ্টকর। রিলিকে নিয়ে কোথাও বেরিয়েছে—হয়তো শোভাবাজারে গেছে। অনেক দিন তো বাপের বাড়ি যায় নি।

ডুপ্লিকেট চাবি মধুর কাছে নেই। বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করবার পথ বন্ধ। পাঁচটার আগে রেবা বাড়ি ফিরবে বলে তো মনে হয় না, এতক্ষণ সময় অতিক্রম করবার একমাত্র জায়গা হল সিনেমা।

আজকের কাগজেই দেখেছে, লাইট-হাউসে হিচককের বই এসেছে। মধু রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল, পৌনে একটা মাত্র।

সিনেমা আরম্ভ হতে এখনও অনেক দেরি, এই সময়টুকু অবশ্য কফি-হাউসে কাটিয়ে দেওয়া যায়। দরজাব গোড়া থেকে সরে আসবার আগেই কিন্তু এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটল।

বাড়ির মধ্যে থেকে কান্নার শব্দ ভেসে এল—রিলি কাঁদছে!

কি অবিশ্বাস্য ব্যাপার। রিলিকে ঘরে বন্ধ করে রেখে রেবা বেরিয়ে গেছে! যতক্ষণ না ফিরে আসবে ও ওইভাবে কাঁদতে থাকবে? চরম অস্থিরতা নিয়ে তালা ধরে টানাটানি করতে লাগল মধু। টাম্বলারের প্যাডলক টানলে খুলে যাবার বস্তু নয়।

অসহায় দৃষ্টিতে মধু চারদিকে তাকাতে লাগল। ওই দরজা না খুললে বাড়িতে প্রবেশ করা যাবে না কোনমতে। রিলি তখন বিরামহীনভাবে কেঁদে চলেছে। নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজায় বারকতক ধাক্কা মারল। কোন লাভ হল না। সেগুন কাঠের দরজা ভাঙা তো দূরের কথা, একটু চিড় পর্যন্ত খেল না।

মধু উপায়ন্তর না দেখে হরিহরবাবুর বাড়ি দৌড়ে গেল। হরিহর রায় তার প্রতিবেশী। তিনি নিজের বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন; মধুকে উত্তেজিতভাবে প্রবেশ করতে দেখে বললেন, কি হয়েছে মধুসূদন?

মধু নিজের মুখের ভাবকে সাধ্যমত স্বাভাবিক করে বলল, আপনার কাছে পুরোন চাবির গোছা আছে? একটা তালার চাবি হারিয়ে ফেলেছি—দেখতাম একবার।

গোছা আছে। তালাটা কোন মেকার?

টাম্বলারের প্যাডলক।

প্যাডলক! তার ডুপ্লিকেট তো হবে না।

মধু নিরাশ হয়ে হরিহরবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। প্যাডলকের ডুপ্লিকেট যে যেখানে-সেখানে পাওয়া যায় না, এ কথা তার খেয়াল ছিল না। বাড়ির সামনে ফিরে আরেক দৃশ্যের অবতারণা

লক্ষ্য করল। দরজায় তালা নেই।

অর্থাৎ রেবা ফিরে এসেছে। স্পন্দন অসম্ভব দ্রুত হয়ে উঠল মধুর। নিজের উত্তেজনাকে আপ্রাণভাবে দমন করতে করতে সে গিয়ে করাঘাত করল দরজায়।

রেবা খুলে দিল দরজা। ওর চোখে উত্তেজনার কোন ছায়া দেখতে পাওয়া গেল না। স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন করল, আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে?

মধু দরজা অতিক্রম করল; বলল, সেক্রেটারি মারা যাওয়ায় কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে।

রিলির কান্না বন্ধ হয়েছে; সে ফিডিং-বটলে দুধ খাচ্ছিল।

তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

রেবার মুখে এবার আশঙ্কার ছায়া পড়ল, তুমি কতক্ষণ এসেছ?

কোথায় গিয়েছিলে?

দোকানে গিয়েছিলাম। গোটাকয়েক টুকিটাকি জিনিস কেনবার ছিল।

ভবিষ্যতে রিলিকে একলা ফেলে কোথাও যাবে না। ভয় পেয়ে গিয়ে অসম্ভব কেঁদেছে মেয়েটা।

ঘুম পাড়িয়ে গিয়েছিলাম। এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়বে, কে জানতো। কাপড় বদলে খাবার ঘরে এস, চা দিচ্ছি।

মধু আর কথা না বাড়িয়ে কাপড় বদলাতে গেল।

দিন দশেক পরে।

একটার সময় কলেজ সাসপেণ্ড হয়ে গেল। বাড়ি ফিরতে মধুর কুড়ি মিনিটের বেশি সময় লাগল না। আজও পূর্বদৃশ্যের প্রতিফলন দেখতে পেল, দরজায় তালা লাগানো। রেবা বেরিয়েছে—রিলিকে সঙ্গে করে নিয়েই বেরিয়েছে নিশ্চয়।

আজ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হল না। সেই দিনের পর থেকে তালার দ্বিতীয় চাবিটা নিজের কাছে রেখেছে। তালা

খুলে ভিতরে যাবার পরই রক্ত চনচন করে তার মাথায় চড়ে গেল। রিলিকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় নি রেবা, নিজের বিছানায় সে অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

নিঃশ্বাসের চাপে তার জীর্ণ বুক উঠছে-নামছে। শুকনো মুখে নেতিয়ে রয়েছে বিছানায়। রেবার মায়া হয় না? একা ফেলে চলে যায় কিভাবে? রিলির কাছে বসল মধু। সুনন্দার কথা মনে পড়ল। কয়েকদিন থেকে তার কথা বেশি করে মনে পড়ছে।

আজ সুনন্দা বেঁচে থাকলে রিলির জন্য এত চিন্তা কি তাকে করতে হত? কি প্রয়োজন ছিল তাকে এই চিন্তার সাগরে ডুবিয়ে তার পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার?

কিন্তু রেবা কোথায় গেল? সেদিন তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল মধু, রিলিকে একা ফেলে কোথাও যেন না যায়। তবু সে একা বেরিয়ে গেল কেন? ওর এই হৃদয়হীন স্বভাবের জন্য মধু মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হল।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। রেবার দেখা নেই।

রেবা ফিরল সাড়ে তিনটের কিছু পরে। তালা খোলা অবস্থায় দরজা ভেজানো দেখেই ও বুঝে নিয়েছিল মধু ফিরে এসেছে। তার মুখে কিঞ্চিৎ বিহ্বলতার ছাপ পড়ল। দরজা ঠেলে ভেতরে গেল রেবা। মধু রিলিকে কোলে নিয়ে বারান্দায় পায়চারি করছিল; স্ত্রীকে দেখে ভ্রূ কুঁচকালো।

রেবা স্বাভাবিক গলায় বলবার চেষ্টা করল, কখন ফিরলে?

গম্ভীর গলায় মধু বলল, পৌনে একটায়।

এত তাড়াতাড়ি ফিরেছিলে? কলেজ বুঝি সাসপেণ্ড হয়ে গিয়েছিল?

আমাকে প্রশ্ন করে নিজের দোষকে ঢাকবার চেষ্টা কোরো না। কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

রেবা চুপ করে রইল।

চুপ করে রইলে যে? কোথায় গিয়েছিলে?

কোথাও যাবার স্বাধীনতাটুকু পর্যন্ত আমার নেই? তোমাকে জিজ্ঞেস না করে গেলেই চোখ রাঙিয়ে প্রশ্ন করবে?

তীক্ষ্ণ গলায় মধু বলল, উল্টো চাপ দেবার চেষ্টা কোরো না। আমি জানতে চাই, কোথায় গিয়েছিলে—কেন গিয়েছিলে?

কৈফিয়ৎ চাইছো?

হ্যাঁ কৈফিয়ৎ। তোমাকে আমি বারণ করে দিয়েছিলাম, রিলিকে একা ফেলে কোথাও যাবে না। তা সত্ত্বেও তুমি কেন গিয়েছিলে? তোমার শরীরে দয়া-মায়া নেই? এই অবোধ শিশুকে একা ফেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইরে কাটিয়ে এলে?

রেবা এগিয়ে এসে মধুর হাত ধরল। বলল নম্র গলায়, আমার ভুল হতে নেই বুঝি?

এ-রকম মারাত্মক ভুলকে আমি অনিচ্ছাকৃত অপরাধ বলে মনে করতে পারছি না। আমি একটুতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ি। তোমাকে হয়তো···

বিশ্বাস করো, আমি ভেবেছিলাম, যাব আর আসব। এত দেরি হয়ে যাবে আমার ধারণা ছিল না।

কিন্তু পরিতাপের কথা আমি যে পয়েণ্টের ওপর স্টিক করে রয়েছি, তুমি তার কাছ ঘেঁষেও যেতে পার নি। তাড়াতাড়ি হোক বা দেরী হোক—তুমি একা বেরিয়েছিলে কেন? আমি তোমাকে বলে রেখেছি, যখনই বেরুবে রিলিকে সঙ্গে নিয়ে ছাড়া বেরুবে না।

বলছি তো, ভুল হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে আর এ-রকম হবে না। রিলিকে আমায় দাও। যাও, কাপড়-চোপড় ছেড়ে এস লক্ষ্মীটি। আমি ওকে শুইয়ে দিয়ে তোমার জন্য চা তৈরি করি।

মধু আর কথা বাড়াল না, রিলিকে রেবার কোলে দিয়ে কাপড় বদলাতে গেল।

সপ্তাহখানেক পর কিন্তু একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। কলেজ থেকে অসময় বাড়ি ফিরে রেবাকে দেখতে পেল না মধু। রিলি তখন

কেঁদে চলেছে। মধুর মনের কানায় কানায় বিরক্তি ভরে উঠল। মেয়েকে সে কোলে তুলে নিল। কোলে তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে রিলির।

মধু নিজেকে কেমন অসহায় বোধ করতে লাগল। মন খারাপ হয়ে গেল অসম্ভব। এখন তার কর্তব্য কি? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল। রিলির আশু চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। রিলিকে একা রেখে ডাক্তার ডেকে আনা সঙ্গত বিবেচনা করল না মধু। মেয়েকে নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

কয়েক পা এগিয়েছে একটা ট্যাক্সি এসে থামল। রেবা নামল ট্যাক্সি থেকে। ও মধুকে দেখতে পায় নি—ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বাড়ির ভেতরে গেল।

ডাক্তারখানা বেশি দূরে নয়। তার বাবার আমল থেকে ডাক্তারবাবু তাদের বাড়িতে যাওয়া-আসা করছেন। রিলিকে তিনি ভালোভাবে পরীক্ষা করলেন। ওষুধ লিখে দিয়ে বললেন, ভয়ের কিছু নেই।

ওষুধ নিয়ে মধু বাড়ি ফিরে এল। দরজার গোড়ায় দেখা হল রেবার সঙ্গে। ওর মুখে ভয়ের ছাপ। মধু কিছু না বলে রিলিকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। রেবা এল তার পিছু পিছু।

থার্মমিটার দিয়ে রিলির জ্বর দেখা হল, একশ' এক।

মৃদু গলায় রেবা প্রশ্ন করল, জ্বর হয়েছে?

হ্যাঁ।

মাথায় জলপটি দেব?

ডাক্তার জলপটি দেবার কথা বলেন নি।

আমি বুঝতে পারি নি, ওর শরীর খারাপ হয়েছে। যখন বেরিয়েছিলাম, ও তখন ঘুমোচ্ছিল। যদিও···

তোমাকে কোন প্রশ্ন করি নি। কেন কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে বিব্রত হচ্ছো।

আমার বেরিয়ে যাওয়া অন্যায় হয়েছে।

মধু তীক্ষ্ণ গলায় বলল, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বুঝতে পার নাকি? তা যদি পারতে, বারংবার রিলিকে এইভাবে একা ফেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে না।

রেবা আর কিছু বলল না।

তিন দিন কলেজে গেল না মধু। রিলি সুস্থ হয়ে উঠল এই তিন দিনেই। চতুর্থ দিন কলেজে যাবার আগে রেবার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি কলেজে যাচ্ছি। রিলিকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। ওকে একা ফেলে দুপুরে কোথাও যাবে না।

এই তিন দিন ধরে মধু অনেক কথার সঙ্গে এ-কথাও ভেবেছে, রেবা দুপুরে যায় কোথায়? বাপের বাড়ি গেলে সে-কথাই বা পরিষ্কার করে বলে না কেন? বিরাটিতে যায় কি? লাবণ্যদির কাছে সময় কাটিয়ে আসে? যদি তাই হয়, তবে স্বীকার করতে বাধা কোথায়?

প্রকৃত ব্যাপার বোধ হয় অন্য কিছু। এমন কিছু, যা বলতে সঙ্কোচ হয় রেবার। আবার না গিয়েও উপায় থাকে না। এমন কি এই তিন দিনের মধ্যেও পাঁচ মিনিটের জন্য বেরুচ্ছি বলে তিন ঘণ্টা বাড়ির বাইরে কাটিয়ে এসেছে কয়েক-বার।

কোথায় যায়? কেন যায়?

মধু অনুসন্ধান করে দেখবে, রেবার দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার উৎস কোথায়? শোভাবাজারে, ওর বাপের বাড়িতে সন্ধান নিয়ে জানা গেল, গত দু-মাসের মধ্যে ও সেখানে যায় নি। লাবণ্যদির ওখানে বিরাটিতেও যায় নি মাস চারেক।

একটা বাঁকা সন্দেহ মধুর মনের মধ্যে গুলিয়ে উঠল।

আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে করতে যখন কলেজে গেল, তখন দুটো। একটা ক্লাশ নেওয়া হল না। তার জায়গায় নিশ্চয় অন্য কাউকে ক্লাশ নিতে প্রিন্সিপ্যাল পাঠিয়েছিলেন। পোর্টিকোর কাছে প্রফেসর সরকারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি হাসবার চেষ্টা করতে করতে পাশ কাটিয়ে দ্রুতপায়ে চলে গেলেন।

মধু লক্ষ্য করেছে কিছুদিন ধরে সহকর্মীরা তাকে একটু এড়িয়ে চলছেন। সময় সময় তাকে দেখলে চাপা গলায় কি সমস্ত নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। ছাত্ররাও তার সম্পর্কে আজকাল উৎসাহী হয়ে উঠেছে। তাঁকে দেখলে তারা বিচিত্র হাসি ফুটিয়ে তোলে নিজেদের মুখে।

ব্যাপার কি ?

অন্যদিন হলে সরকারের ব্যবহারকে গুরুত্ব দিত না মধু। আজ তার মনে অস্থিরতা ছিল। সরকারকে ওইভাবে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে দেখে কান গরম হয়ে উঠল তার।

শুনুন···

সরকার নিজের গতি রোধ করলেন, আমাকে বলছেন ?

এখানে আর কেউ নেই। আমি জানতে চাই, কিছুদিন ধরে আমার সম্পর্কে আপনাদের ব্যবহার ভদ্রতা-বিরুদ্ধ হয়ে উঠছে কেন ?

প্রফেসর সরকার কয়েক পা এগিয়ে এলেন, আপনার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না।

বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছেন। আমাকে নিয়ে কি এত আলোচনা হয় আপনাদের মধ্যে, বলবেন কি ?

নাই বা শুনলেন। তবে এটুকু জেনে রাখুন, কথাটা কলেজের গভর্নিং বডির সেক্রেটারির কানেও উঠেছে।

কথাটা কি ?

সরকারের মুখে বিদ্রূপের হাসি দেখা দিল। বলল, বললাম তো, নাই বা শুনলেন।

বরেনবাবু—

দেখুন মশাই, আমাকে চোখ রাঙিয়ে কোন লাভ হবে না। বরং নিজের স্ত্রীকে গিয়ে ধমকান, তাতে হয়তো তিনি নিজের চরিত্র কিছু সংযত করতে পারেন।

মধু হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে সরকারের কলার চেপে ধরতে যাচ্ছিল, ঠিক এই সময় হাঁ-হাঁ করে তর্করত্ন মশাই দুজনের প্রায় মধ্যে

এসে পড়লেন।

একি…একি, কি হচ্ছে তোমাদের ?

আপনার ছাত্র ভালো বলতে পারবেন।

নিজের কাঁধ একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে সরকার স্থান ত্যাগ করলেন।

কি, হয়েছে কি ? তোমাকে তো ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোক বলেই জানতাম।

মধু নিজেকে সংযত করে নিয়েছে এক লহমার মধ্যে। কলেজ প্রেমিসেসের মধ্যে একি সিন ক্রিয়েট করতে যাচ্ছিল সে। ভাগ্যক্রমে কোন ছাত্র এখানে উপস্থিত ছিল না এই রক্ষে।

মধু ঘটনাটা বলল তর্করত্ন মশাইকে। শেষে বলল, স্ত্রীর সম্বন্ধে ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলতে দেখে নিজেকে স্থির রাখতে পারি নি।

গম্ভীর মুখে তিনি সমস্ত শুনলেন। এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন, কয়েকদিন থেকে কিছু কিছু কথা আমার কানেও আসছে। বৌমা নাকি—

রেবার কথা বলছেন স্যার ?

হ্যাঁ। দেখ মধুসূদন, গৃহকে সামলে রাখার দায়িত্ব গৃহকর্তার। সে দায়িত্ব পালন করতে যদি গৃহকর্তা উদাসীন হয়, তবে তাকে ঠকতে হবে।

আপনি কি বলতে চাইছেন স্যার ?

আমি তোমার পিতৃস্থানীয়। আজ পর্যন্ত যা কিছু বলেছি, তোমার ভালোর জন্যই বলেছি। একটু শক্ত হও। বৌমা নাকি আজকাল এমন সমস্ত লোকের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, যারা সমাজের নিম্নশ্রেণীর জীব। কলেজের অনেকেই দেখেছে। কানাকানি হওয়া স্বাভাবিক !

মধুর শরীরের সমস্ত রক্ত হঠাৎ অসম্ভব গরম হয়ে উঠল, কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। রাগ আর বিরক্তি তার মনকে প্রায় পিষে ফেলল, একটা কথাও বলল না সে। বলল না বললে ভুল হবে, বলতে পারল না। বিস্মিত তর্করত্ন মশাইয়ের সামনে দিয়ে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে

কলেজ কম্পাউণ্ড অতিক্রম করল। তিন দিন বাড়িতে কাটিয়ে আজ কলেজে এসেছিল, কিন্তু কলেজ করা আর হল না।

মধু ফিরে চলল বাড়িতে। ট্যাক্সিতে মিনিট পনেরোর বেশি লাগল না।

ভেজান দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই সে লক্ষ্য করল, পরিপাটি করে সেজে, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে রেবা বাইরে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে; মধুকে দেখেই ওর মুখে ভয়ের ছায়া ফুটে উঠল।

ভয়কে জয় করবার ক্ষমতা তার অপার। মধু কিছু বলার আগেই শান্ত গলায় ও বলল, তুমি এসে পড়েছ, ভালোই হল—আমি বেরুচ্ছি।

আমি না এসে পড়লেও তুমি বেরুতে।

বেরুতেই হত যে…

ফেটে পড়ল মধু, আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম, তা সত্ত্বেও একটা দুধের বাচ্চাকে একলা ফেলে তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছ? নিজের স্বভাবকে বদলাতে এতটুকু ইচ্ছে করে না তোমার! ভগবান জানেন, তোমার মন কি দিয়ে গড়া।

রেবা নিজের গলার আওয়াজ চড়িয়ে বলল, তুমি চাও, এই চার-দেওয়ালের মধ্যে দিনের পর দিন থেকে আমি নিজের জীবন নষ্ট করে দেব? আমার দ্বারা তা হবে না।

তুমি যা বলছ, আমি তা কোনদিন চাই নি। আমার যা কিছু বক্তব্য সমস্তই রিলিকে নিয়ে।

রিলি—রিলি—অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। তোমার স্ত্রীর দরকার ছিল না, দরকার ছিল মেয়েকে দেখাশুনা করবার জন্য একজনকে। বিয়ে করে লোক হাসাতে গেলে কেন, একজন গভর্নেস রাখলেই পারতে। টাকার তো আর অভাব নেই।

আমি তোমাকে ধরে-বেঁধে বিয়ে করি নি। তোমাদের পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব এনেছিলেন লাবণ্যদি। আমার স্ত্রী হয়ে এ-বাড়িতে প্রবেশ করবার পর কোন্ গুরুদায়িত্ব হাসি-মুখে হাতে তুলে নিতে হবে, তা তোমার অজানা ছিল না।

রেবা দরজার দিকে এগিয়ে গেল, লেকচার দিতে থাক। বাজে কথা শোনবার সময় আমার নেই, চললাম।

দাঁড়াও...

না।

বাইরে যাওয়া তোমার হবে না।

তোমার হুকুমে?

হ্যাঁ; আমার হুকুমে।

আরো সত্তর বছর আগে তোমার জন্মানো উচিত ছিল, নিজের স্ত্রী'কে হুকুম দিয়ে ওঠ-বোস করাতে পারতে।

বিদ্রূপ গলায় ঢেলে দিয়ে মধু বলল, তখন এই ধরনের হুকুম করবার অবকাশ আমি পেতাম না, কারণ তোমার মত স্বেচ্ছাচারী স্ত্রী সে-যুগে মাথা কুটে মরে গেলেও পাওয়া যেত না। তুমি যদি ভেবে থাক, আমি কিছুই জানি না, তবে বলতে হবে ভুল ধারণা নিয়ে আছো। শুধু আমিই নয়, কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্ররা—ওরা তোমার রাস-লীলার কথা জেনে ফেলে আমায় মাথা হেঁট করে দিয়েছে। লজ্জা করে না? ভদ্রঘরের বৌ হয়ে যার-তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছো? আর কেউ না জানলেও আমি জানি, তাদের সঙ্গ লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা তোমার কত তীব্র!

রেবা কল্পনা করতে পারে নি, মধু এত তাড়াতাড়ি সব জেনে ফেলবে। একটু ইতস্তত করে অধর-দংশন করে বলল, আমি এমন কিছু করি নি, যার জন্য এত কথা বললে। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কিছু সময় কাটালে তা যে তোমার এবং তোমার কলেজের আর সকলের চোখে দোষনীয় হয়ে উঠবে, বুঝতে পারি নি।

বন্ধু যখন পুরুষ, সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। আমরা যতই অনুকরণ করি না কেন, পাশ্চাত্য ভাবধারায় নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিতে আমাদের এখনও কয়েকশ' বছর লাগবে বোধ হয়। মেয়ে-পুরুষের বন্ধুত্বকে আমরা সন্দেহের চোখে দেখতে অভ্যস্ত। আর সেই সন্দেহ-জনক কাজ তুমি করছ!

মধু রিলির কাছে গিয়ে বসল। রিলি অকাতরে ঘুমুচ্ছে। তার ছোট শরীর বিছানার সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে। পাণ্ডুর মুখ, এক ফোঁটা রক্তও যেন শরীরে নেই।

কেউ কোন কথা বলল না কয়েক মিনিট। রেবা দাঁড়িয়ে রইল একইভাবে। শেষে অনেকক্ষণ পরে বলল, এখন কি করতে চাও তুমি?

কোন্ বিষয়ে?

আমি তোমার একমাত্র প্রবলেম। আমার বিষয় কি করতে চাও, জানতে চাইছি।

রিলির দিক থেকে মুখ না সরিয়ে মধু বলল, কিছুই করতে চাই না। তুমি আমার প্রবলেম হিসেবে বিরাজ করতে থাক, তাও আমার অভিপ্রেত নয়। তুমি নিজেকে একটু সংযত কর, অতীতের সমস্ত কথা আমি ভুলে যেতে রাজি আছি।

রেবা এগিয়ে এল; বসল মধুর পাশে। সঙ্কোচ জড়ানো গলায় বলল, পরিণামের কথা চিন্তা না করেই সময় সময় অনেক কাজ করে ফেলি, পরে অনুশোচনা করতে হয়। ভবিষ্যতে এমন আর কোন কাজ করব না, যাতে তুমি কোন অভিযোগ তুলতে পার।

মধু কিছু বলল না, রিলির মুখের দিকে তাকিয়েই বসে রইল।

বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতেই কেটে গেছে আরো একটি মাস। আর কোন অভিযোগ উত্থাপন করবার অবকাশ দেয় নি রেবা। মধু যে-কোন সময় ফিরে এসে দেখেছে ও বাড়িতে আছে। রিলিকে নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে। খুশি হয়েছে সে। রেবার সম্পর্কে নিজের মনোভাবকে আমূল পরিবর্তন করবার জন্য ব্যস্ততা অনুভব করেছে।

আরেক বিষয় নিয়ে মধু চিন্তা করে দেখেছে।

কলেজে তাকে নিয়ে আলোচনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সময় সময় ক্লাস নেওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে। ফাজিল, উদ্ধত ছোকরা সব কালেই কলেজে কিছু থাকে। রোল করার সময় নিজের রোল নম্বর

-না বলে রেবার নাম উচ্চারণ করার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত ঘনঘন।

এইভাবে দিনের পর দিন চলতে পারে না, মধু চিন্তা করে স্থির করে ফেলেছে এ কলেজ ছেড়ে দেবে। এমন কি কলকাতার কোন কলেজে যোগ দেবে না, কোন মফঃস্বলে নিজের কর্মকেন্দ্র বেছে নেবে। চেষ্টা করছিল। অল্প দিনের মধ্যেই বহরমপুর কলেজ থেকে আহ্বান এল।

মধু বলল রেবাকে, কাজে যোগ দেবার আগে জায়গাটা আমার মনোমত হবে কিনা একবার দেখে আসা দরকার, কি বল?

বহরমপুর তো শুনেছি বেশ ভালো জায়গা।

জায়গা ভালো সন্দেহ নেই, তবু একবার যাওয়া দরকার। আমি বরং কালই রওনা হয়ে যাই, একটা বাড়ি ঠিক করে আসি এই ফাঁকে। দিন তিনেকের মধ্যেই ফিরব। রিলির দিকে নজর রেখো, ওর শরীর আবার দিন কয়েক থেকে ভালো যাচ্ছে না।

মধু বহরমপুরে চলে গেল।

ভালোই লাগল জায়গাটা তার। কলেজের সেক্রেটারি ও প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা হল, তুজনেই অমায়িক, ভদ্র ব্যক্তি। ছোট একটা একতালা বাড়ি অল্প ভাড়াতেই পাওয়া গেল। বাড়িওলাকে তু-মাসের ভাড়া অ্যাডভ্যান্স করে ঠিক তিন দিনের মাথায় কলকাতায় ফিরল মধু।

তখন সন্ধ্যা হতে কিছু দেরী আছে, সূর্য সবে পাটে বসতে চলেছেন। নিজের বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে মধু নামল। দরজায় তালা লাগান। রিলিকে নিয়ে রেবা কোথাও বেরিয়েছে, এই কথা ভেবে নেওয়াই স্বাভাবিক। ডুপ্লিকেট চাবি কাছেই ছিল। তালা খুলে মধু ভিতরে গেল।

সে কল্পনাও করতে পারে নি ভিতরে তার জন্য এক কল্পনাতীত মর্মন্তুদ দৃশ্য অপেক্ষা করছে। বারান্দা অতিক্রম করে সে নিজের শোবার ঘরে গেল। বাইরে কিছু আলো অবশিষ্ট থাকলেও, ঘরের মধ্যেটা ছায়া ছায়া। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপল।

আলোর বন্যায় ঘর ভরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে গেল মধু। রিলি বিছানায় পড়ে আছে, স্থির নিস্পন্দ তার শরীর। অসংখ্য মাছি উড়ে বেড়াচ্ছে তার চারপাশে, চাক বেঁধে বসেছে শরীরের এখানে-ওখানে। সম্বিত ফিরে পাবার পরই একটা বিশ্রী সন্দেহ মধুর মনের মধ্যে গুলিয়ে উঠল, ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানার ওপর।

তার সন্দেহ অলীক নয়। রিলির ছোট্ট দেহে প্রাণ নেই, বহুক্ষণ পূর্বেই মারা গেছে সে। কাঠিন্যের ঢল নেমেছে সমস্ত শরীরে। মনের মধ্যে হু-হু করে উঠল মধুর। রিলি চলে গেল! তার অপরাধ কি। চলে যাওয়া ছাড়া তো উপায় ছিল না। এত উপেক্ষা, এত অত্যাচার ওই ছোট্ট প্রাণে আর কতদিন সইবে?

বিছানায় মুখ গুঁজে ছোট ছেলের মত মধু হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল। এইভাবে কতক্ষণ কেঁদেছে জানে না। মুখ তুলল একসময়—সন্ধ্যা গাঢ় হয়েছে তখন। অস্থিসার, বিবর্ণ রিলির ওপর মাছির উপদ্রব আগেকার মতই রয়েছে।

মধু নিজের মনের মধ্যে দৃঢ়তা আনবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। তাকাল না সুনন্দার ছবির দিকে। দু-হাত দিয়ে রিলির প্রাণহীন দেহ তুলে নিল। বাড়ির বাইরে এসে একটা রিক্সায় উঠে বসল, রিক্সা-চালককে নির্দেশ দিল নিমতলায় যেতে।

শ্মশান থেকে মধু ফিরল রাত দশটার পর। এখন যে কোন পরিচিত লোক তাকে দেখলে চমকে উঠতেন। এই ক'ঘণ্টায় তার বয়স বেড়ে গেছে যেন দশ বছর। সমস্ত মুখ রেখায় রেখায় কণ্টকিত হয়ে উঠেছে। শ্লথ পায়ে নিজের ঘরে প্রবেশ করার মুখে দেখা হয়ে গেল রেবার সঙ্গে; ও ভয়-চকিত মুখে দাঁড়িয়েছিল।

মধু কিছু বলবার আগেই ও কিন্তু-কিন্তু গলায় বলল, কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল—এ-রকমটা হতে পারে আমি বুঝতে পারি নি।

মধু এই কথাগুলির অপেক্ষায় বোধ হয় ছিল; ফেটে পড়ল

একেবারে—ছোটলোক, ইতর মেয়েমানুষ, বুঝতে পার নি। ষড়যন্ত্র করে আমার জীবনের কোমল অবলম্বনকে এইভাবে কেড়ে নিয়ে এখন বলছ, তুমি বুঝতে পারো নি!

তুমি বিশ্বাস করো…

থাক, কোন কথা আমি শুনতে 'চাই না। রিলি চলে গেছে, তোমারও এই বাড়িতে থাকা হবে না। বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও এই মুহূর্তে!

ঘটনা এইপথে গতি নেবে কল্পনা করতে পারে নি রেবা। কান্না জড়ানো গলায় বলল, কি বলছ তুমি! বেরিয়ে যাব—কোথায় বেরিয়ে যাব!

যাবার জায়গার অভাব কি? এতক্ষণ আমার মান-সম্মান নিয়ে যার সঙ্গে খেলা করে এলে, সে তো তোমায় লুফে নেবে।

ক্ষমা করো তুমি আমায়, আমার ভুল হয়ে গেছে। এ-রকম ভুল জীবনে আর হবে না।

আমার জীবনটা ছারখার করে দেবার পরও অভিনয়! আমি তোমাকে আর সহ্য করতে পারছি না।

আরো কিছু বলবার ইচ্ছে ছিল মধুর, কিন্তু বলতে গিয়েও থেমে গেল। ধীরগতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে, বারান্দা পেরিয়ে বাড়ির বাইরে চলে এল। চারদিকের অবস্থা তখন থমথমে। আকাশের পরতে পরতে মেঘ। বৃষ্টি নামবে। মধুর মনের আকাশে বৃষ্টি হবার কিন্তু কোন সম্ভাবনা নেই, ঝড় বইছে, প্রবল ঝড়।

নিজের কাহিনী শেষ করে মধুসূদন গুপ্ত অন্যমনস্কভাবে সিগারেট ধরালেন। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন মৃগাঙ্ক ঘোষ। সুকুমারও। ওই মানুষটির জন্য দুজনের মনেই সহানুভূতি তিরতির করে কাঁপছিল।

মিনিট পাঁচেক কেটে গেল নীরবেই। শেষে মৃগাঙ্ক বললেন, শেষ-পর্যন্ত কি হল?

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মধুসূদন বললেন, সেদিন সারাটা রাত পার্কেই কাটিয়ে দিলাম। বাড়ি ফিরেছিলাম, সকাল আটটার পর। ফিরে এসে রেবাকে দেখতে পাই নি। হাট করে খোলা ছিল সদর দরজা। শূন্যতায় বাড়িখানা খাঁ খাঁ করছিল। ফিরে এসে দশ মিনিটও অপেক্ষা করলাম না সেখানে, বাড়িতে তালা লাগিয়ে সোজা চলে এলাম স্টেশনে। বহরমপুর গিয়ে ওখানকার কলেজে যোগ দিলাম—অবশ্য মন বসিয়ে কাজ করতে পারলাম না! ওখান থেকে গেলাম রামপুরহাটে। এইভাবে কলেজে কলেজে ঘুরতে ঘুরতে মুঙ্গেরে গেছি। কতদিন টিঁকতে পারব জানি না। আমার কথা শেষ হল। মিস্টার ঘোষ, এবার আপনি আরম্ভ করুন।

মৃগাঙ্ক বললেন, আমার কাহিনী আপনার বা সুকুমারবাবুর মত ব্যর্থতার ইতিহাস নয়। বরং বলতে পারেন, রসাল উপন্যাস, যা তারিয়ে তারিয়ে পড়তে ভালো লাগে। সময় অনেক গড়িয়ে গেছে, কাহিনী শেষ করতে দুপুর-রাত হয়ে যাবে। যতদূর সংক্ষেপে সম্ভব সেরে নিচ্ছি।

কয়েক মিনিট চুপ করে রইলেন। কাহিনীটা মনের মধ্যে সাজিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলেন বোধ হয়। গলা খাঁকারি দিয়ে আরম্ভ করলেন শেষে।

আমাদের আদি বড়ি হল রাণাঘাটে। একান্নবর্তী পরিবার ও বিরাট চক-মেলানো বাড়ির চার-দেয়ালের মধ্যে আমার প্রথম যৌবনের সোনালি দিনগুলো কেটেছিল। লেখা-পড়ায় বিশেষ ভালো ছিলাম না। আমরা মনপ্রাণ দিয়ে লেখাপড়া করি, তাও অবশ্য গুরুজনরা চাইতেন না। তাঁরা চাইতেন, প্রাথমিক শিক্ষাটুকু কোনরকমে শেষ করতে পারলেই হল। তারপর ঢুকে পড় পৈতৃক ব্যবসায়ে।

বছর পনেরো বয়েস হবার আগেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম,

আমাদের পরিবারের পুরুষদের নৈতিক চরিত্র বলে কিছু নেই। ঠাকুর্দা বেঁচে থাকাকালীন দেখতাম, বাবা ও কাকারা মদে চুরচুরে হয়ে টলতে টলতে বাড়ি ফিরতেন। নিজেদের স্ত্রীকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতেন, প্রহার করতেন নির্দয়ভাবে। যেটুকু সঙ্কোচ ছিল—অবশ্য সঙ্কোচ যদি থেকে থাকে, ঠাকুর্দা মারা যাবার পর তাও ঘুচে গেল। বাইরের বাড়ির ঘরে-ঘরে বাঙালী-অবাঙালী অনেক মেয়ের আবির্ভাব হল। তাদের চেহারার জেল্লায় চোখ ধাঁধিয়ে যেত। আমার গুরুজনেরা তাদের নিয়ে রাতের পর রাত কামনার সাগরে সাঁতরে বেড়াতে লাগলেন।

এই দেখতে দেখতেই আমি বড় হলাম। সময় সময় মন উদ্বেল হয়ে উঠত, একটা পাশব চিন্তা মনকে সাপটে ধরত। আজ বলতে লজ্জা হচ্ছে—সেদিন মনে হত, ওদেরই মধ্যে একজনকে সকলের অগোচরে কাছে টেনে আনি। নিরানন্দ মনে দিন কেটে যাচ্ছিল।

দৈবাৎ একটা সুযোগ এসে উপস্থিত হল। খুড়তুতো বোনের বিয়ে ছিল। বাড়িতে বিরাট ধুমধাম। বাবা লক্ষ্ণৌ থেকে এক নামকরা বাঈজী আনলেন। ডুলারীবাঈ—যেমন তার চেহারার চটক, তেমনি তার চলনে-বলনে দুর্বার আকর্ষণ। যৌবন অবশ্য মুঠো থেকে বেরিয়ে গেছে। বয়স চল্লিশের কিছু নিচে। কোন বিশেষ কৌশলে শরীরকে ধরে রেখেছে বলে মেঘে মেঘে বেলা হয়েছে বুঝতে পারা যায় না।

বাবা ও কাকাদের মধ্যে ডুলারীবাঈকে নিয়ে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেছে লক্ষ্য করলাম। উঁচু ঘরানার বাঈজীরা গান গেয়েই জীবন কাটিয়ে দেয়। দেহের বেসাতি করে না। ডুলারীবাঈ কোন উঁচু ঘরানার কিনা আমার জানা ছিল না, তবে দেহের বিনিময়ে কিছু উপরি রোজগার করে নেওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না সহজেই বুঝতে পারলাম।

ডুলারীবাঈ সম্পর্কে আমার কোন দুর্বলতা ছিল না। আমার বয়স তখন বাইশ। কামনার আগুনে যতই জ্বলতে থাকি না কেন, তবু নিজের বয়স অপেক্ষা পনেরো-ষোল বছরের বড় কোন নারীর

ওপর দুর্বলতা প্রকাশ করার মত নিম্ন রুচি আমার ছিল না। আমি প্রেমে পড়ে গেলাম দুলারীবাঈয়ের ষোড়শী কন্যা নিম্মির।

আমাকে স্টেশনে পাঠান হয়েছিল ওদের রিসিভ করে আনতে। একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরা থেকে সকলে নামল। তবলচি, সারেঙ্গী-বাদক ইত্যাদি সকলকে নিয়ে জন ছয়েক লোক। ওদের মধ্যে নিম্মিকে আবিষ্কার করলাম। আমার মাথা ঘুরে উঠল। বাপ-কাকাদের দয়ায় সুন্দরী মেয়ে কম দেখি নি, তবে এমনটি আগে দেখেছি বলে স্মরণ হল না।

এক বাটি দুধের মধ্যে দশ ফোঁটা আলতা ফেলে দিলে যেমন রঙ হয়, নিম্মির গায়ের রঙ ঠিক তেমনি। হরিণ চোখ বুঝি একেই বলে। গোলাপের পাপড়ির মত ঠোঁট। সুদৃশ্য মাপসই নাক। নাকে মুক্তা বসানো নথ, সোনার চেন দিয়ে কানের সঙ্গে আটকানো।

অকারণেই অসহ্য আনন্দ আমাকে পেয়ে বসল। প্রায় টলতে টলতে ওদের নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। চোখে-চোখে রাখতে লাগলাম নিম্মিকে। হাজার চেষ্টা করেও কিন্তু একান্তে তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে নিতে পারলাম না। তাকে শুধু নিজের পরিচয়টুকু দিতে পেরেছিলাম স্টেশন থেকে বাড়ি ফেরার পথে।

বিয়ের রাতে গানের আসর বসল।

সকলের সঙ্গে আমি বসলাম তাকিয়া হেলান দিয়ে। ছায়ানটের সে সুর আজও কানে লেগে আছে, কি গানই গেয়েছিল সেদিন দুলারীবাঈ। গানের দিকে কান থাকলেও আমার চোখ ছিল নিম্মির মুখের ওপর, নির্বিকার মুখে সে বসেছিল বৃদ্ধ তবলচির পাশে।

পৌনে এগারোটার সময় নিম্মি আসর ছেড়ে উঠে গেল—এখুনি নিশ্চয় ফিরে আসবে। কিন্তু সাড়ে এগারোটা বেজে যাবার পরও ফিরল না। আমার মাথায় একটা পরিকল্পনা খেলে গেল—সকলে এখানে রয়েছে, এই অবসরে নিম্মির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ করতে দোষ কি? সমস্ত রাত গান চলবে, আসর ছেড়ে দুলারীবাঈ বা তার সাঙ্গপাঙ্গদের কারুর উঠবার সম্ভাবনা নেই।

উঠি উঠি করেও বারোটার আগে উঠতে পারলাম না। চলে এলাম গেস্ট-হাউসে। কারুর চোখ বাঁচিয়ে আসার জন্য কোন সর্তকতা অবলম্বন করবার প্রয়োজন ছিল না। সন্ধ্যা লগ্নে বিয়ে হয়ে গেছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিমন্ত্রিতরা চলে গেছেন দশটার আগে। যাঁরা রয়ে গেছেন, তাঁরা গিয়ে বসেছেন গানের আসরে। ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। মৃদু ঠেলা দিতেই খুলে গেল। জোরালো আলোটা নেভানো ছিল, জ্বলছিল বেডরুম ল্যাম্প। প্রথমে কিছু ঠাহর করতে পারলাম না।

মিনিট খানেকের মধ্যে চোখ সয়ে এল। দেখলাম, বিছানায় আড় হয়ে শুয়ে আছে নিম্মি। ঘুমিয়ে পড়ে নি, এপাশ ওপাশ করছে। বিছানার পাশে চন্দন কাঠের টিপয়ের ওপর পোর্টের বোতল। গেলাসে তরল নেশা টলটল করছে কয়েক মিনিট ইতস্তত করলাম আমি, চৌকাঠের ওপাশেই আমার পা অনড় হয়ে রইল। শেষ পর্যন্ত নিজের ইতস্তত ভাবকে আমি জয় করলাম মনে ধিক্কার এল, বাইজীর মেয়ের সঙ্গে কথা বলব, তার জন্য এত ইতস্তত কিসের। ঘরে প্রবেশ করলাম।

নিম্মি মোহময় চোখে তাকাল আমার দিকে। স্খলিত গলায় বলল, কে...

আমি।

আমি কে?

আমি মৃগাঙ্ক।

ও।

তুমি আসর থেকে চলে এলে কেন?

হাসল নিম্মি—এক আঁচলা মুক্তা যেন ঝরে পড়ল। বলল,আমার নেশার সময় হয়ে গিয়েছিল যে!

তুমি মদ খাও?

খাই।

এই বয়সে!

আমার কত বয়স হয়েছে বলুন তো?

কত আর হবে, পনেরো।

উনিশ। বাইজীর মেয়েরা কত বয়সে মদ ধরে জানেন?

না।

বারো বছর থেকে। বুঝতে পারছেন বোধ হয়, আমি পুরোন পাপী।

ঈষৎ জড়ানো হলেও নিম্মির অসঙ্কোচ কথাবার্তা আমার মনে ক্রমেই দাগ কেটে চলল। বিছানার একপাশ দেখিয়ে দিয়ে, গলা ঝেড়ে নিয়ে বললাম, বসব?

বসুন।

বসলাম। কিছুক্ষণ কোন কথা হল না। নিম্মি তাকিয়ে রইল আমাদের এক পূর্বপুরুষের অয়েল-পেন্টিংয়ের দিকে। মরণ-উন্মুখ মুগ্ধ পতঙ্গ যেমন প্রদীপের চারপাশে পাক খেতে থাকে, আমার চোখ সেইভাবে নিম্মির মুখের চারপাশে পাক খেয়ে চলেছে বলতে পারলে ভালো হত। সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজের যেন দু-চোখ দিয়ে তাকে লেহন করে চললাম।

বেশিক্ষণ এইভাবে কাটল না, দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে ফেললাম —একটা হাত চেপে ধরলাম। বাধা দিল না নিম্মি—নেশায় মন রঙীন হয়েছিল বলে কিনা অবশ্য জানি না। আমার শিরায় শিরায় আগুন ছুটতে লাগল। আমি দু হাত দিয়ে ওকে আকর্ষণ করলাম।

নিম্মির মুখে প্রশ্রয়ের হাসি।

আমি ঝুঁকে পড়লাম।

এবার বাধা দিল সে। মৃদু গলায় বলল, এখুনি কেউ এসে পড়বে।

কেউ আসবে না।

বাজিয়েদের মধ্যে কেউ এসে পড়তে পারে।

করুণ গলায় বললাম, আমাকে কাছ থেকে সরিয়ে দিও না নিম্মি, তোমার জন্যে আমি পাগলের মত হয়ে গেছি।

নিম্মি কিছু বলল না, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমার ঘরে যাবে ?

আপনার ঘরে !

হ্যাঁ। সেখানে কেউ আসবে না. আপত্তি কোরো না, চলো।

হাত দিয়ে আমাকে সরিয়ে নিম্মি উঠে দাঁড়াল। টিপয়ের ওপর থেকে গেলাসটা তুলে নিয়ে পোর্টের শেষ বিন্দুটুকু গলায় ঢেলে দিল। পড়ে যাচ্ছিল, ধরে ফেললাম। সে আমার বাহুর মধ্যে আশ্রয় পেল। আমি সবিস্ময়ে শুনলাম ; সে বলছে, আপনার ঘর কত দূরে ?

কাছেই ; এস।

আমরা দুজন অগ্রসর হলাম।

এরপরের আমার কয়েক ঘণ্টা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখ দিয়ে মোড়া ছিল। গানের আসর শেষ হবার আগে অর্থাৎ ভোর হবার মুহূর্তে, নিম্মিকে তার ঘরে ফিরিয়ে দিয়ে আসব এই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা ঘটে উঠল না।

ঘুম ভাঙল প্রবল ডাকাডাকিতে। ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলাম। নিম্মিরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ; সে নিজের প্রায় নগ্ন দেহটাকে তাড়াতাড়ি কাপড় দিয়ে ঢেকে নিল। আমার বুকের মধ্যে হাতুড়ি পড়তে লাগল। কাচের জানলা ভেদ করে সূর্যের আলো ঘরে ঠিকরে পড়েছিল। বেশ বেলা হয়ে গেছে।

তবে কি জানাজানি হয়ে গেল ? প্রায় কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে দরজা খুললাম। যা ভেবেছিলাম, তার একচুল ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলাম না। বাবা কাকাদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন গম্ভীর মুখে। দুলারীবাঈও উপস্থিত। দরজা খুলে দিতেই ছোটকাকা আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। পরমুহূর্তে নিম্মির হাত ধরে টানতে টানতে বেরিয়ে গেলেন। আর সকলে আমার ওপর বজ্রাঘাতের মত কটাক্ষ হেনে তাঁকে অনুসরণ করলেন।

আমি ভয়ে আধ-মরা হয়ে নিজের ঘরে পড়ে রইলাম। নিজের অসতর্কতার জন্য হাত কামড়াতে ইচ্ছে করতে লাগল। ঘুমিয়ে না পড়লে এই কেলেঙ্কারি হত না। নিম্মি সকলের অগোচরে নিজের

ঘরে ফিরে যেতে পারত, এই ঘটনাকে আঁচ করে নেওয়া কারুর পক্ষে সম্ভব হত না। বেলা গড়িয়ে চলল। সাড়ে দশটার সময় অনন্ত এল।

অনন্ত আমার পিসতুতো ভাই—আমাদের বাড়িতেই থাকে। বয়সে কিছু বড় হলেও দুজনের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে। সে ঘরে ঢুকেই বলল, বেশ খেল দেখালে যা হোক।

কি এমন দোষের করেছি? বাপ-কাকার পদাঙ্ক অনুসরণ করা কি অন্যায়?

এ-বাড়িতে অন্যায় নয়। আসল কথা হল, ছুঁড়িটা যদি নথ পরে না থাকত, তাহলে কোন গোলমালই বাধত না।

আমি সবিস্ময়ে বললাম, নথ! নথের সঙ্গে গোলমালের কি সম্পর্ক?

অনন্ত আকাশ থেকে পড়ল, তুমি কিছুই জান না?

না তো!

অবাক কাণ্ড! ওই জাতের উঠতি বয়সের নথ-পরা মেয়ে দেখলে বুঝবে তারা ভার্জিন। বুঝলে কিছু? সে যে কোন পুরুষ মানুষের সঙ্গে রাত কাটায় নি—নথ হল তার সাইন।

বেশ: তারপর?

তারপর আর কি, অনেক পয়সাওয়ালা বাবু তার উমেদার হবে। ওদেরই মধ্যে একজনকে বেছে নিয়ে নথ খুলে সে তার খাস হয়ে থাকবে। চড়া টাকায় নিম্মির নথ খুলবেন তোমার ছোট কাকা স্থির হয়ে রয়েছে। এদিকে তার নাকে নথ থাকতে থাকতেই তুমি কাণ্ডটা বাধিয়ে বসলে।

আমি অবাক! নথের নেপথ্যে এত ব্যাপার আছে কে জানত?

আধঘণ্টাটাক থাকার পর অনন্ত চলে গেল। আমি আকাশপাতাল ভাবতে লাগলাম। কাকাদের আবির্ভাব হল ঘণ্টাখানেক পরে। পুত্রের ব্যবহারে নিদারুণ লজ্জিত হয়ে পড়ায় বাবা বোধ হয় আর এলেন না। তাঁরা ঘরে ঢুকেই আমাকে তিন দিক থেকে আক্রমণ

করলেন। লেকচারের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলেন। আমার মত চরিত্রহীন ছেলে নাকি তাঁদের বংশে আর জন্মায় নি। কথার পর হাত ছুটল। বলা বাহুল্য ছোট কাকা নিজের মনের ঝাল ঝাড়লেন আমার ওপর জুতো দিয়ে।

নির্বিকার মুখে আমি মার খেলাম। শেষে তাঁরা জানালেন, আমি বাড়িতে থাকলে তুলারীবাঈ এখানে থাকবে না। নিম্মিকে নিয়ে চলে যাবে বিকেলের ট্রেনে। সুতরাং আমার এখানে থাকা চলবে না। আমাকে যেতে হবে গ্রামের বাড়িতে গোমস্তাদের কাজ তদারক করতে। বাবারও এই মত।

আমি কোন কথা বললাম না।

নিদারুণ অভিমান মনের মধ্যে গুলিয়ে উঠতে লাগল। তুলারীবাঈ চলে যাবে বলে এঁরা আমাকে বাড়ি থেকে সরিয়ে দিতে চাইছেন! বাড়ির ছেলের চেয়ে বাঈজী এঁদের কাছে অনেক বড়। বিকেলে একটা সুটকেশ সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। গ্রামে গেলাম না। গেলাম কলকাতায়। এরপর পাঁচটা বছর কেমন ভাবে কেটেছিল, তার ইতিহাস নাই বা শুনলেন। এইটুকু জেনে রাখুন, সুখে কাটে নি।

পাঁচ বছর পরে মানিকতলার মোড়ে একদিন রাণাঘাটের এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তাঁর মুখে শুনলাম অনেক পরিবর্তন হয়েছে বাড়ির। কাকারা পৃথক হয়ে গেছেন, বাবা কঠিন রোগে শয্যাগত। প্রতি মুহূর্তে আমাকে খুঁজছেন।

বাড়ি যাওয়াই স্থির করলাম।

বাবা যেন আমার অপেক্ষায় নিজের প্রাণ ধরে রেখেছিলেন। ওখানে পৌঁছবার পরের দিনই তিনি মারা গেলেন। মা আগেই গত হয়েছিলেন, কাজেই আমি সম্পূর্ণ দায়মুক্ত হলাম। শ্রাদ্ধ চুকে যাবার পর আমি কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্য চলে এলাম। আসবার আগে অবশ্য ছোট কাকাকে একটা আধবয়সী নথ-পরা মেয়েমানুষ উপহার পাঠাতে ভুলি নি। এখন আমার অনেক টাকা।

জীবনটাকে ভাসিয়ে দিলাম ফুর্তির জোয়ারে। তবে বাবা-কাকাদের মত বেশ্যা আর বাঈজীদের নিয়ে নাচানাচি আমার পোষাল না। আমি কলগার্ল সংগ্রহ করতে লাগলাম।

সে সমস্ত দিনের বিস্তারিত কাহিনী শোনাতে গেলে আপনাদের ক্লান্তিকর মনে হবে। থাক। আমি বরং আমার বর্তমানের সঙ্গিনী রক্তিমাকে কিভাবে সংগ্রহ করলাম, তাই বলি।

কলকাতার পচা গরমে সিদ্ধ হয়ে যাবার পর দার্জিলিং গিয়েছিলাম বেজায় ভীড়। যাদের ক্ষমতা আছে তারা তো বটেই, যাদের ক্ষমতা নেই, তারাও ধারধোর করে গরমকে তালাক দিয়ে এখানে চলে এসেছে।

অনেক কষ্টে হোটেলে জায়গা পেলাম।

হোটেলটি প্রথম শ্রেণীর নয়। না হোক, মাথা গোঁজবার জায়গা যে পাওয়া গেছে এই যথেষ্ট। বোর্ডাররা কেউ সাধারণ শ্রেণীর নয়। জোড়ায় জোড়ায় সব বাসা বেঁধেছেন। আমি কাউকে নিয়ে যাই নি। ইচ্ছে ছিল সম্ভব হলে এখান থেকেই সংগ্রহ করে নেবো।

দিন বেশ ভালোই কাটছিল। মুরগির কারি ওরা রাঁধত চমৎকার। খিদেও বেড়েছিল প্রচণ্ড। খেতাম আর ঘুরে বেড়াতাম। সেদিন বেরিয়েছি, হেঁটে চলেছি সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে। নির্জন পথ। হঠাৎ দেখলাম, ফুটপাথের রেলিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে দুজন মেয়ে-পুরুষের উচ্চগ্রামে কথা কাটাকাটি হচ্ছে। কাছে যেতেই চিনতে পারলাম, আমার পাশের ঘরের ব্যারিস্টার আর তার স্ত্রী। ব্যারিস্টারের সুশ্রী স্ত্রীর মুখ আমার মনে ছাপ ফেলেছিল আগেই তাকে স্বপ্নও দেখেছি দুদিন। রাস্তার মাঝে তাদের কি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলেছে কে জানে! আমাকে দেখেই দুজনে চুপ করে গেল। আমি কিছুই শুনতে পাই নি, এমনি ভান করে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম।

আসল ঘটনাটা ঘটল সেদিন মাঝ রাত্রে।

প্রচণ্ড চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল। চেঁচামেচি আসছে পাশের

ঘর থেকে। ব্যারিস্টার মদের ঝোঁকে চিৎকার করে চলেছে। কান্নার শব্দও পেলাম। ভদ্রমহিলা কাঁদছেন। আমার গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। আমার কেন, দোতলার সমস্ত বোর্ডারের। প্রথম দু-একদিন আমরা সকলে ঔৎসুক্য দেখিয়েছিলাম। ক্রমে বুঝতে পেরেছি, মদ যখন ব্যারিস্টারকে চেপে ধরে, তখন তাঁর আর মুখের আগল থাকে না।

আমি পাশ ফিরে শুলাম। অকথ্য গালাগালি শুনতে শুনতেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল দরজায় করাঘাতে। সকাল হয়ে গেল নাকি? বয় চা নিয়ে এসেছে। এপাশ-ওপাশ করে উঠে পড়লাম। দরজা খুলে দিতেই বিস্ময়ের প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। সকাল হয় নি, বয়ও নয়। ব্যারিস্টার-পত্নী শোচনীয় মুখের অবস্থা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

দরজা খুলতেই তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। কাতর গলায় বললেন, দরজা বন্ধ করে দিন।

তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলাম।

কি হয়েছে বলুন তো?

আমি পালিয়ে না এলে মিঃ রায় আমাকে গুলি করে মারতেন।

মিঃ রায়! ও, ব্যারিস্টার সাহেব। কেন, তিনি আপনাকে গুলি করে মারবেন কেন?

সে অনেক কথা। আপনি ভদ্রলোক, আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন?

বলুন!

আমি কাল কলকাতা ফিরে যেতে চাই। একলা যাওয়া অসম্ভব; কোন ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?

আমি সতর্কতার সঙ্গে ভদ্রমহিলাকে লক্ষ্য করছিলাম। কোথায় যেন একটা খিচ আছে। শেষ রাত্রে অপরিচিত পুরুষের ঘরে এসে সাহায্য প্রার্থনা করা অতি মাত্রায় নাটকীয় বলে মনে হচ্ছিল।

বললাম, ব্যবস্থা! দেখুন, আপনাদের দাম্পত্য-কলহের মধ্যে

আমার মাথা গলানোটা কি ঠিক হবে?

দাম্পত্য-কলহ!

মানে···আপনার স্বামী ব্যাপারটাকে সুনজরে দেখবেন না।

ভদ্রমহিলা এবার পরিষ্কার গলায় বললেন, আমি কারুর বিবাহিত স্ত্রী নই।

আমি হতভম্ব! মানে···আপনি···

আমাকে কাল চলে যেতে হবেই। আপনি আমাকে সাহায্য করবেন, না অন্য কারুর সাহায্য নিতে হবে?

আমার উপবাসী মন রসাল খাদ্যের সৌরভে চনচনে হয়ে উঠল। স্ত্রী নয় ব্যারিস্টারের—রক্ষিতা। কোন কারণে আর বনছে না। ঝগড়া ঘোরাল হয়ে উঠেছে। ভালোই হল। ভগবান আছেন স্বীকার করতেই হবে। আর প্রশ্ন নয়, এবার বাস্তবেই বোধ হয় এই রূপময়ীকে করায়ত্ব করা যাবে।

কালই যেতে চান?

হ্যাঁ।

বেশ, বেলা আটটার সময় আমি মল রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকব; আপনি আসবেন। ট্রেন ধরতে অসুবিধে হবে না। আপনি এখানে বিশ্রাম করুন, আমি ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

ট্রেনে আলাপ জমে উঠল। কলকাতা পৌঁছবার আগেই রক্তিমাকে আমি নিজের করে নিতে পারলাম। বলতে ভুলে গিয়েছিলাম তার নাম রক্তিমা। এই পেশায় নেমেছে অনেকদিন। কলকাতার অনেক রুই-কাতলার মনের মানুষ হয়ে তার দিন কেটেছে।

এরপর অনেকদিন কেটে গেছে। রক্তিমার এখন আমি বাঁধা খদ্দের। অবশ্য রক্ষিতা বললে তার ওপর অবিচার করা হয়। সে আমার স্ত্রীর মত হয়ে গেছে।

মৃগাঙ্ক ঘোষ নিজের কাহিনী শেষ করে হাই তুললেন।

সুকুমার কিছু বলতে গিয়েও বলল না।

মধুসূদন গুপ্ত সিগারেট ধরালেন।

মৃগাঙ্ক বললেন, এবার উঠি, অনেক রাত হল। ভালো কথা, কাল তুপুরের খাওয়াটা আপনারা আমার বাসায় সারবেন।

এসব ঝামেলা আবার কেন করলেন? সুকুমার বলল।

ঝামেলা নয়; কয়েকদিন থেকেই ভাবছিলাম। রান্না কিন্তু রক্তিমাই করবে। তার হাতে খেতে নিশ্চয়ই আপনাদের আপত্তি নেই!

সুকুমার বলল, ও-সমস্ত সংস্কার আমাব নেই।

মিঃ গুপ্ত···

মধুসূদন সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বললেন, আপত্তি আবার কিসের? যাব।

হোটেলে প্রত্যহ চপ, কাটলেট খাচ্ছেন। আমি সামান্য ঝোল-ভাতের ব্যবস্থা করব। একটু মুখ বদলাবেন আর কি। চলি—

মৃগাঙ্ক ঘোষ বিদায় নিলেন।

বেলা সাড়ে এগারোটার সময় সুকুমারকে নিয়ে মধুসূদন পৌঁছোলেন মৃগাঙ্কর বাড়িতে। ঠিকানা জানা থাকলেও আগে কখনো আসেন নি। টালির ছাদ দেওয়া বাংলো-বাড়ি। এক-দেড় কাঠার ওপর ফুল বাগানও আছে।

দরজার গোড়ায় মৃগাঙ্ক দাঁড়িয়েছিলেন। মহা সমাদরে তুজনকে নিয়ে গেলেন ভেতরে।

সম্পূর্ণ দিশী প্রথায় বসবার ঘরটি সাজানো।

তক্তপোষের ওপর তিনজনে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসলেন। মিনিট দশেক কথাবার্তার পর মৃগাঙ্ক বলললেন, বারোটার সময় খেতে বসলেই হবে, কি বলেন? তার আগে বরং রক্তিমার সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই।

সুকুমার বলল, বেশ তো।

তিনি ভেতরে চলে গেলেন। মিনিট কয়েক পরে এলেন, সঙ্গে

অপূর্ব একটি নারী-মূর্তি। সাজের বাহুল্য চোখে পড়ে না। নমস্কার করে দাঁড়াল সে। মৃগাঙ্ক পরিচয় করিয়ে দিলেন। সুকুমার স্তম্ভিত হয়ে গেছে। এক নজর দেখে সে মাথা নত করে ছিল। এক নজরেই এতদিন পরেও রত্নাকে তার চিনতে অসুবিধে হয় নি। তার হৃদয়কে নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলেছিল, সেই রত্না এত নীচে নেমে এসেছে।

রত্নার স্বভাব ভালো ছিল না। ছিল না হৃদয় বলে কিছু। এর-ওর সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করেই সে আনন্দ পেতো। কল্পনার শেষ প্রান্তে চলে গেলেও সুকুমারের মনে স্থান পেতো না। রত্নার পববর্তী জীবন কাটবে এই নক্কারজনক জীবিকায়।

সে কি সুকুমারকে চিনতে পারছে?

মধুসূদন গুপ্ত থরথর করে কাঁপছেন। একি দেখলেন তিনি। মৃগাঙ্ক ঘোষের রক্ষিতা তাঁরই স্ত্রী রেবা!! রেবার নৈতিক মান ভালো ছিল না। তবে সে যে এতদূব নীচে নামতে পারবে, তিনি কল্পনা করেন নি। প্রবল বিরক্তি মধুসূদনকে গ্রাস করল। কেন আসতে গেলেন তিনি নৈনিতালে? এখানে না এলে তো রেবার এই রূপ দেখতে হত না!

ও কি চিনতে পেরেছে তাঁকে?

মৃগাঙ্ক দুজনেব ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন না। রক্তিমাকে তাড়া দিলেন, বেলা চড়ে গেছে, এবার আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করো—

সম্মতিসূচক ভাবে ঘাড় নেড়ে, হাসি মুখে রক্তিমা ভেতরে চলে গেল। মিনিট দশেক পরে দরজার পর্দা সরিয়ে, মুখ বাড়িয়ে বলল, ভাত দেওয়া হয়েছে, ওঁদের নিয়ে এসো।

মৃগাঙ্ক বলেছিলেন, দুটি ঝোল-ভাতের ব্যবস্থা হবে। খেতে বসে সুকুমার দেখল রাজসিক ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য ঝোল অনুপস্থিত। খেতে ইচ্ছে করছিল না; সমস্ত কিছু বিস্বাদ লাগছিল। ইচ্ছে করছিল কাউকে কিছু না বলে এক ছুটে কোথাও চলে যায় এখান থেকে।

মধুসূদন কিছুই খেলেন না। বারংবার মৃগাঙ্কর অনুরোধকে এড়িয়ে যেতে পেট ভারের দোহাই দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ভাতে হাতে করে তিনি উঠলেন। তিনজনে গিয়ে বসলেন বাইরের ঘরে।

মৃগাঙ্ক অনুযোগ করলেন, কিছুই খেলেন না আপনারা। এরকম পাখির মত আহার করলে শরীর টিকবে ভেবেছেন?···ইয়ে···কেমন দেখলেন আমার রক্তিমাকে?

মধুসূদন ধরা গলায় বললেন, আপনি ভাগ্যবান পুরুষ!

সুকুমার ভায়া, আপনার মত কি?

সুকুমার গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, এত সুন্দরী মেয়ে আমি আগে কোথাও দেখি নি!

পান এলো—রক্তিমা দিয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক আরো কথাবার্তা হল। গল্প তেমন জমল না। শিষ্টাচার বজায় রইল ঠিকই, কোথায় যেন তাল কেটে যেতে লাগল। মৃগাঙ্ক সতর্কতার সঙ্গে দুজনের মুখের ভাব লক্ষ্য করছিলেন।

তিনি বললেন, গল্প তেমন জমছে না। রক্তিমা আপনাদের মনে কিঞ্চিৎ বিপ্লব ঘটিয়েছে বলে মনে হচ্ছে!

মুখে হাসি টেনে আনবার ব্যর্থ চেষ্টা করে মধুসূদন গুপ্ত বললেন, আপনি তো মশাই আমাদের হিংসার পাত্র হয়ে উঠলেন। মধ্যযুগ হলে কি করে বসতাম বলা যায় না—

গলা ফাটিয়ে হাসলেন মৃগাঙ্ক।

সুকুমার বলল, এবার আমি উঠব। গোটা কয়েক চিঠি লিখতে হবে হোটেলে গিয়ে।

আমিও উঠব। মিঃ ঘোষ, আপনি নিশ্চয়ই বিকেলে আসছেন?

সুকুমার ও মধুসূদন নিষ্ক্রান্ত হলেন।

হোটেলে নিজের ঘরে ফিরে সুকুমার চিঠি লেখে নি। কাউকে চিঠি লেখবার ছিল না। কথাটা বলেছিল, ওখান থেকে চলে আসবার

অজুহাত হিসেবে। ফিরে এসে শুয়ে পড়েছিল। বিচিত্র সমাপতন। যাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিল, সেই কিনা দিনের পর দিন মৃগাঙ্ক ঘোষের পাশব মনোবৃত্তির খোরাক জুগিয়ে চলেছে! কেন দেখা হল রত্নার সঙ্গে সুকুমারের?

কাটা ঘায়ের ওপর নুনের ছিটে পড়েছে যেন। যে নৈনিতালে আসবার জন্যে সে বছরের পর বছর ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করেছে, কত রঙীন কল্পনা তার মনকে রসাসিক্ত করে তুলেছে, সেই নৈনিতালে সুকুমারের আর এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করছে না।

অজস্র চিন্তায় সুকুমারের মন ভারি হয়ে উঠল।

মধুসূদন গুপ্ত ঘরে ছিলেন না। ঘরের লাগোয়া ঝুলন্ত বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। ঘুনের মত অসংখ্য চিন্তা তাঁর মনকে কুরে কুরে খাচ্ছে। কি আশ্চর্যের বিষয়। এই সুদূর নৈনিতালে রেবার সঙ্গে এই ভাবে দেখা হয়ে যাবে কে ভেবেছিল!

মধুসূদন স্থির করে ফেললেন নৈনিতালে আর নয়। শৈলাবাসে শান্তিতে দিন অতিক্রম করবার সাধ তাঁর মিটেছে। রেবার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া যেন শুকিয়ে যাওয়া ঘায়ের ওপর নতুন করে খোঁচা লেগে যাওয়ার মত। তবে যাবার আগে একটা কাজ সেরে যাবেন মধুসূদন। তাঁর জীবনকে ছন্নছাড়া করে দিয়ে রেবা যে পরম নিশ্চিন্ততায় জীবন কাটাবে, তা হবে না। তা তিনি হতে দেবেন না। ওর সুখ-শান্তিতে প্রচণ্ড আঘাত করে তবে এখান থেকে বিদায় নেবেন।

অন্যান্য দিনের মত মৃগাঙ্ক এলেন সন্ধ্যার সময়।

অন্ধকার বারান্দায় চুপ করে বসেছিলেন মধুসূদন। সুকুমার ঘরেই ছিল। বিকেলের পর থেকে একটা বিষয় তার কাছে অস্বাভাবিক ঠেকছিল। হঠাৎ মধুসূদন গুপ্ত আবার অন্য মানুষ হয়ে গেলেন কেন? তাঁর এই ভাবান্তরের কারণ কি? রত্নাকে দেখে কি তাঁর অন্য কারুর কথা মনে পড়ে গেল?

মৃগাঙ্কর সাড়া পেয়ে মধুসূদন ঘরে এলেন।

সুকুমার বলল, আপনারা বসুন ; মিনিট পনেরোর মধ্যে আমি এক জায়গা থেকে ঘুরে আসছি।

ছুজনকে কোন প্রশ্ন করার অবকাশ না দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দ্রুতপায়ে সিঁড়ি অতিক্রম করে, পার্লার পেরিয়ে হোটেলের বাইরে এলো। মৃগাঙ্ক ঘোষের বাড়ি পৌঁছতে মিনিট পাঁচেকের বেশি সময় লাগল না। সামনেটা অন্ধকার ; শুধু একটা জানালার ঘষা কাচের মধ্যে দিয়ে হাল্কা আলোর আভা চোখে পড়ছে।

অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে কলিংপুশটা হাতের কাছে পেলো সুকুমার। আঙুল দিয়ে বার কয়েক চাপ দেবার পর দরজা খুলে গেল। দরজার ওপাশে রক্তিমাকে দেখতে পেলো সুকুমার। কোন কথা না বলে সে ভেতরে ঢুকল। দরজা বন্ধ করে দিল তারপর।

ছুজনেই নির্বাক কয়েক মিনিট।

তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ ?

হ্যাঁ।

যাক, তবু ভালো। আমি তো ভেবেছিলাম অচেনার ভান করে চমৎকার অভিনয় করবে।

নির্বিকার গলায় রক্তিমা বলল, আমি জানতাম তুমি আসবে—

সশ্লেষে সুকুমার বলল, তাই নাকি ! এসে কি বলব, তাও বোধ হয় আঁচ করে নিয়েছ ?

পুরোন সম্বন্ধটা বোধ হয় ঝালিয়ে নিতে চাও !

ওকথা তুলতে তোমার লজ্জা করছে না ! শুধু তোমার ব্যবহারে আমি সমস্ত মেয়ে জাতটার ওপর খড়গহস্ত হয়ে আছি, তা কি জানো ?

বোকার মত তুমি যদি কাজ করে থাকো, সে জন্যে দায়ী আমি নই। বরং আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত—পাঁকের মধ্যে তলিয়ে যাওয়ার হাত থেকে আমি তোমাকে বাঁচিয়েছি।

বাঁচিয়েছ, না আরো ডুবিয়ে দিয়েছ ?

রক্তিমা খিলখিল করে হেসে উঠল।

ডিয়ার সুকুমার, বাঁচিয়েছি। সুন্দরী মেয়ে দেখলেই পাগলের মত প্রেমে পড়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। পাত্রীর উপযুক্ততা বিবেচনা করে দেখতে হয়। তুমি নির্বোধের মত আমাকে আঁকড়ে ধরেছিলে। আমার ব্যবহার ভবিষ্যতের জন্যে তোমাকে সতর্ক করে দিয়েছে।

উত্তেজিত গলায় সুকুমার বলল, কপাল দেখে মানুষ চেনার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি নষ্ট চরিত্রের মেয়েমানুষ বুঝতে পারলে নিশ্চয়ই মিশতাম না।

চরিত্র তখন আমার একেবারে খারাপ হয়ে যায় নি। তখন আমাকে অ্যামেচার বলা যেতে পারত, এখন প্রফেশনাল।

চমৎকার! এই ঘৃণ্য জীবন যাপন করার চেয়ে পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে না তোমার?

কেন, কোন্ দুঃখে? আমিও তো বলতে পারি, ওই সমস্ত বস্তা-পচা সেন্টিমেণ্টকে নদীর জলে তোমরাও তো পারো ভাসিয়ে দিতে। যাক, পুরোন কাসুন্দি ঘাঁটতে ভালো লাগে না। জানতে পারি কি, চরিত্রবান পুরুষটি ঘোষ মশাইয়ের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে এখানে কেন এসেছেন?

সুকুমার গম্ভীর গলায় বলল, আমি এসেছি তোমার ওপর প্রতিশোধ নিতে।

প্রতিশোধ!

চমকে উঠছ কেন? পৃথিবী বিরাট জায়গা। আবার যে তোমার দেখা পাব, ভাবতে পারি নি। দেখা যখন পেয়েছি, ছেড়ে দেবো না তোমাকে। আমার মত নির্বিরোধ সাদামাটা মানুষকে তুমি ঠকিয়েছিলে; আজও মৃগাঙ্ক ঘোষের মত ধনী, হাল্কা চরিত্রের মানুষকে ঠকিয়ে চলেছ। এ সুযোগ আর তুমি পাবে না।

কি করবে?

প্রশ্ন করো কি করব না! তোমার ওই সুন্দর মুখ অ্যাসিড দিয়ে গলিয়ে দেবো।

আর্ত-চিৎকার করে উঠল রক্তিমা। ছিটকে সরে গেল ঘরের আরেক প্রান্তে।

কি বললে?

বললাম তো, অ্যাসিড দিয়ে তোমার সুন্দর মুখ গলিয়ে দেব, তখন পৃথিবীর বোকা পুরুষও তোমার দিকে ফিরে তাকাবে না। তোমার মুখময় দগদগে ঘা হয়ে যাবে, রস পড়বে। চোখ চিরদিনের মত নষ্ট হয়ে যেতে পারে—চুল পুড়ে যাবে।

না,…না…

ভয় পেয়ে যাচ্ছো?

তুমি আমাকে মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছ।

মিথ্যে নয়, বাস্তবে এই ঘটনা ঘটবে।

কেন তুমি আমাকে এরকম করবে সুকুমার? আমাকে ঘৃণা করো, আমাকে উপেক্ষা করো…

জোরে হেসে উঠল সুকুমার।

ভয়ে কাঁপতে আরম্ভ করলে দেখছি! এতগুলো বছর ধরে তোমাকে ঘৃণা করেছি, উপেক্ষা করেছি, তখন ভাবি নি আবার দেখা হবে। দেখা যখন হয়ে গেল, প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে। নিজের বুকের জ্বালা মেটাবার জন্যে শুধু এ প্রতিশোধ নয়। জানি, মৃগাঙ্ক ঘোষই তোমার শেষ মক্কেল নয়। একদিন এঁকে লাথি মেরে তুমি আরেক জনের কাছে চলে যাবে—আরেক পয়সাওয়ালার কাছে। তাকে দেউলিয়া করে যাবে অন্য জনের কাছে। অর্থ-সংগ্রহের জন্যে এই বেপরোয়া পরিক্রমা আমাকে অ্যাসিডের সাহায্যে প্রতিরোধ করতে হবে। এখন চললাম।

সুকুমার, আমার দিকে তাকিয়ে দেখ…

তোমার সুন্দর মুখ আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

সুকুমার…

আর দিন তিনেক সময় তুমি হাতে পাচ্ছো। চলি।

সুকুমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিপর্যস্ত মন নিয়ে রক্তিমা দাঁড়িয়ে রইল। তার অসম্ভব ভয় করতে লাগল। অসম্ভব রাগ হতে লাগল মৃগাঙ্কর ওপর। কেন সে উপযাচক হয়ে এদের বাড়ি নিয়ে এসেছিল। শুধু সুকুমার নয়, মধুসূদনও আছে। তার অভিযোগ সুকুমারের চেয়ে অনেক বেশি। সে কি আসবে না কিছু বলতে ?

রক্তিমা বেশিক্ষণ চিন্তা করবার অবকাশ পেল না। খোলা দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন আড্ডাবাড়ির কুমার বাহাদুর। একটু ঝুঁকে পড়া তাঁর শীর্ণ শরীর দামী স্যুটে ঢাকা। কুৎসিত মুখে অতৃপ্তির হাসি। হাতে সুদৃশ্য হাতির দাঁতের ছড়ি। ছড়ি দোলাতে দোলাতে তিনি এগিয়ে গেলেন।

চমকে উঠেছিল রক্তিমা। কুমার বাহাদুরকে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। মধুসূদন গুপ্ত নয়।

আমার বুলবুলি গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে কেন ?

এমনি। আপনাকে বাড়িতে ঢুকতে কেউ দেখে নি তো ?

না। তবে আমি একজনকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম। কে ছিল লোকটা ?

রক্তিমা হাসবার চেষ্টা করল—আমার একজন প্রাক্তন প্রেমিক।

নৈনিতাল পর্যন্ত ধাওয়া করেছে! বাহাদুর ছোকরা তো!

ধাওয়া করে নি; হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে।

পকেট থেকে হুইস্কির চেপ্টা বোতল বার করলেন কুমার বাহাদুর। বেশ কয়েক আউন্স গলায় ঢেলে দিয়ে, মুখ মুছতে মুছতে বললেন, এই সমস্ত প্রেমিকরা কিন্তু ডেঞ্জারাস হয়। কি বলে গেল ?

আমি নাকি তার জীবন নষ্ট করে দিয়েছি। ভ্যাজর ভ্যাজর করে কত কি তো বলে গেল। ও নাকি অ্যাসিড দিয়ে আমার মুখ পুড়িয়ে দেবে।

বল কি! অ্যাসিড পর্যন্ত গড়িয়েছে? যাক, ও-সমস্ত কথা। দূরে কেন দাঁড়িয়ে বুলবুল, কাছে এস।

রক্তিমা কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল, আমার ভীষণ ভয় করে—আপনি কিন্তু এখানে আর অপেক্ষা করবেন না।

কুমার বাহাত্বর নিজের তুই শীর্ণ হাত দিয়ে সাপ্টে ধরলেন রক্তিমাকে। নিজের অ্যাল্‌কোহলের গন্ধে ভরপুর মুখ ওর শরীরের এখানে ওখানে ঘষতে লাগলেন।—এলেই যেতে বলো, এইভাবে কতদিন চলবে ?

আপনি তো জানেন, আমি নিরুপায়। ঘোষ যে-কোন মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে। আপনাকে দেখলে···

ঘোষ, ঘোষ আর ঘোষ—আড্ডাবাড়ির কুমার বাহাত্বরের খনখনে গলা আরো খনখনে হয়ে উঠল, তুমি কি তার কেনা বাঁদী নাকি ? যদি দেখেই ফেলে, কি আসবে-যাবে! আমার সামনে তোমায় অপমান করবে ভেবেছ ? সে সাহস তার হবে না। আমি বুঝতে পারি না বুলবুল, তুমি কেন তাকে এখনও ধরে রয়েছ ?

কারণ আছে। আপনাকে পরে বলব।

পরে নয়। এখন বল।

বলছি তো বলব। তু-একদিনের মধ্যেই বলব।

রক্তিমাকে ছেড়ে কুমার বাহাত্বর পেছিয়ে এলেন। অধৈর্য গলায় বললেন, এত কথা আমি বুঝি না। আমি পরিষ্কারভাবে জানতে চাই, তুমি এই ঘোষের গহ্বর থেকে বেরিয়ে আমার কাছে আসবে কিনা ?

আসব না বলি নি তো! শুধু দিন দশেক সময় আমাকে দিন। কিন্তু আর নয়, আর অপেক্ষা করা চলবে না আপনার। এতক্ষণে ঘোষ বোধ হয় সিলভার-অ্যারো হোটেল থেকে রওনা হয়েছে।

কুমার বাহাত্বর কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, রক্তিমা তাঁকে বাধা দিয়ে বলল, আপত্তি করবেন না। আমি কাল তুপুরে বরং কোন রকমে সুযোগ-সুবিধা করে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে আপনার বাড়ি থেকে ঘুরে আসব।

অনিচ্ছার সঙ্গে কুমার বাহাত্বর বিদায় নিলেন। অবশ্য যাবার

আগে একশ' টাকার ক'টা নোট রক্তিমার হাতে গুঁজে দিতে ভুললেন না।

মধুসূদন গুপ্ত মৃগাঙ্ক ঘোষের বাড়ি পৌঁছলেন বেলা দশটার সময়। তিনি শুনেছিলেন, প্রতিদিন মৃগাঙ্ক এই সময় লেকে যান বোটিং করতে। সুতরাং রেবার বাড়িতে একলা থাকারই কথা। সুকুমারের চোখ বাঁচিয়ে অনেক কষ্টে তাঁকে আসতে হয়েছে বলা বাহুল্য।

রক্তিমা রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিল। কলিং বেলের আওয়াজ শুনে ছুটে এল বাইরের ঘরে। এখনও তো মিনিট পনেরোও হয় নি মৃগাঙ্ক বেরিয়েছে, ফিরে এল নাকি? দরজা খুলে দিতেই বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে গেল রক্তিমা। মৃগাঙ্ক নয়, গাম্ভীর্যের মিনার হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মধুসূদন।

গম্ভীর গলায় তিনি বললেন, তোমার সঙ্গে গোটা কয়েক কথা আছে।

সুকুমার আসবে, এ-ধারণা রক্তিমার হয়েছিল—কেন হয়েছিল বলা যায় না। সত্যি যখন সুকুমার এল, তখন তাই তার সঙ্গে স্বাভাবিক-ভাবে কথা আরম্ভ করতে পেরেছিল। মধুসূদন অন্য ধাতুর মানুষ, তিনি ভাঙবেন কিন্তু মচকাবেন না। আর যাই হোক, রক্তিমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে না এটা ঠিক। সেই মধুসূদন এসেছেন।

গলা কেঁপে গেল রক্তিমার—আপনি···

হ্যাঁ। আমি।

উনি তো বাড়ি নেই, লেকে গেছেন। ফিরে এলে কি বলব বলুন?

অভিনয় কোরো না, আমায় চিনতে ঠিকই পেরেছ।

মধুসূদন ঘরের মধ্যে এলেন, এখন বোধ হয় এ-কথাও ভুলে যাও নি, তুমি আমার স্ত্রী। স্বামী বর্তমান থাকতে অন্যের সঙ্গে এইভাবে বসবাস করার অধিকার আইন তোমাকে দেয় নি!

রক্তিমা দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট চেপে ধরল।

তুমি চুপ করে থাকলেও আইন তোমাকে ছেড়ে কথা বলবে না।

তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে।

ডাইভোর্স তো করি নি।

রক্তিমা এতক্ষণে নিজেকে ফিরে পেয়েছে। অধৈর্য গলায় বলল, ঘোরাল কথা আমি শুনতে চাই না, যা বলবার পরিষ্কার করে বল। আমাকে নিয়ে কি করতে চাও তুমি?

এখান থেকে নিয়ে যেতে চাই।

নিয়ে যেতে চাও! আমি নষ্ট হয়ে গেছি জেনেও···

তুমি পবিত্র ছিলে কবে? চিবিয়ে চিবিয়ে মধুসূদন গুপ্ত বললেন, অন্য যে-কোন লোক হলে আগেই বুঝতে পারত, আমি অত্যন্ত বোকা তাই বুঝতে পারি নি—একটা নষ্ট মেয়েমানুষ নিয়ে ঘর করে চলেছি। বুঝতে পারি নি, দিনের পর দিন এঁটো পাতা চাটছি। সেদিন বুঝতে পারলে, আমার রিলি ওইভাবে মারা যেত না।

এখন সবই যখন বুঝতে পেরেছ, তবে আমাকে নিয়ে যেতে চাইছ কেন?

কেন! মধুসূদন জোরে হেসে উঠলেন। তোমাকে চাবুক মারবার জন্য। সেদিন যা করা উচিত ছিল, আজ তা করতে চাই। চাবকে পিঠ ফাটিয়ে রক্ত বের করে দিতে চাই।

রক্তিমার নিঃশ্বাস জোরে জোরে পড়তে লাগল। সে গম্ভীর গলায় বলল, পরের বাড়িতে এসে চেঁচামেচি করাটা ভদ্রতা নয়। যা বলবার তুমি বলেছ, এবার যেতে পারো। মৃগাঙ্কবাবু এসে পড়লে, আমার চেয়ে অনেক বেশি অসুবিধায় তুমি পড়বে।

আমি তো চাই, সে এসে পড়ুক। হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে তোমাকে টেনে নিয়ে যাব, তার সাধ্য হবে না আমাকে বাধা দেবার। কিছুক্ষণের জন্যে আইন আমার হাতের মুঠোর মধ্যে থাকবে রেবা। তারপর অবশ্য তুমি আমার বিরুদ্ধে চার্জ আনতে পার। কিন্তু একটা কথা জেনে রাখো, মৃগাঙ্ক ঘোষ তোমাকে তখন সাহায্য করবে না—যে মুহূর্তে সে জেনে ফেলবে তুমি আমার স্ত্রী। তার সমস্ত ভালোবাসা উবে যাবে।

সে ভয় পেয়ে যাবে। আমার জীবনটা নষ্ট করে দিয়ে তুমি সুখে থাকবে, তা আমি হতে দেব না।

তীব্র গলায় রক্তিমা বলল, যা করবার করতে পারো। এখন যাও, নইলে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব।

মধুসূদন আর কিছু বললেন না, তাঁর মুখে উপেক্ষার হাসি খেলা করতে লাগল। তিনি নিজের বহুবল্লভা পত্নীর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

ওদিকে রান্নাঘরে তরকারি পুড়ছিল। তার উৎকট গন্ধ নাকে এসে লাগলেও রান্নাঘরে যাবার বিন্দুমাত্র আগ্রহও হল না রক্তিমার। ভাবনার পাষাণ ভার তার মাথায় এসে এখন চেপে বসেছে। এ-রকম গুরুতর সমস্যায় সে কখনও পড়ে নি। সুকুমার আর মধুসূদন—দুজনের হাত থেকে বিভিন্নভাবে সে নির্যাতিতা হতে চলেছে।

রক্তিমার সবচেয়ে বেশি রাগ হচ্ছিল মৃগাঙ্কর ওপর। কি প্রয়োজন ছিল তার এই হাঙ্গামা বাধাবার? আগেও তো এসেছে নৈনিতালে, কত লোকের সঙ্গে মৃগাঙ্কর আলাপ হয়েছে—কোনবার তো বাড়ি ডেকে এনে কাউকে খাওয়ায় নি! এবার এই দুর্মতি কেন?

হাতের কাছে সহজ একটা উপায় আছে, কাউকে কিছু না বলে এখান থেকে সরে পড়া। আড্ডাবাড়ির কুমার বাহাদুর মুখিয়ে আছেন, তাকে নিয়ে ভারতের সুদূরতম প্রান্তে চলে যেতে তাঁর আপত্তি হবে না। এক ঢিলে তিন পাখি মারা যায় এতে। সুকুমার ও মধুসূদনকে ফাঁকি দেওয়া যায়। মৃগাঙ্ককে আর ভালো লাগছে না—তার হাত থেকেও নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

হাতের কাছে এই সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রক্তিমা গ্রহণ করতে পারছে না, দুটি বিশেষ বাধা তার পথ রোধ করে আছে। এই বাধা দুটির সৃষ্টিকর্তা মৃগাঙ্ক ঘোষ স্বয়ং। কতক্ষণ এইভাবে বসে বসে রক্তিমা ভাবত বলা যায় না—তার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল এই সময়।

মৃগাঙ্ক ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে ঘরে প্রবেশ করলেন, তাঁর জামা-

কাপড় ভিজে সপসপ করছে। চুলের ফাঁক দিয়ে জল ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ছে গালে। তিনি কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন, বোট থেকে জলে পড়ে গিয়েছিলাম।

কথাটা বলেই তিনি অন্য ঘরে চলে গেলেন। ফিরে এলেন মিনিট পাঁচেক পরে। জামা-কাপড় বদলে এলেন। চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, কি বিশ্রী ব্যাপার বল, লেকের মাঝখানে বোট উল্টে গেল! ভাগ্যিস সাঁতার জানতাম, নইলে আমার লীলাখেলা শেষ হয়েছিল আর কি।

কথা বলতে রক্তিমার ইচ্ছে করছিল না; কিন্তু কিছু না বললেই নয়, তাই গলার স্বর স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করে বলল, প্রতিদিন নৌকায় চড়ার যে কি দরকার আমি বুঝি না।

তোমার বুঝি মনে হয়, ডুবে যেতে পারি?

বিপদের কথা তো বলা যায় না।

মৃগাঙ্ক হাসলেন, ডুবে গেলে তোমার তো বিধবা হবার সম্ভাবনা নেই, তবে কেন এত চিন্তা। আচ্ছা রক্তিমা, একটা সত্যি কথা বলতো, তোমার কোনদিন কারুর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল?

রক্তিমার শরীরের সমস্ত রক্ত বুকের ওপর আছড়ে পড়ল, তোমার কি মনে হয়?

আমার কোন ধারণা নেই, এমনি প্রশ্ন করলাম। যাক ও-কথা, দিন কয়েকের ব্যবহার উপযোগী জামা-কাপড় স্যুটকেশে গুছিয়ে দিও, আজ বিকেলে আমায় লক্ষ্ণৌ যেতে হচ্ছে।

লক্ষ্ণৌ! কেন?

সঠিক কারণ তোমায় বলতে পারব না, আমি নিজেই জানি না। লেকে যাবার আগে একটা টেলিগ্রাম পেয়েছি স্যাভয় হোটেলের ম্যানেজারের কাছ থেকে। তিনি লিখেছেন, আমি যেন অবিলম্বে লক্ষ্ণৌয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। বিশেষ প্রয়োজন আছে।

গত বছর ওই হোটেলেই তো আমরা উঠেছিলাম। কি যেন নাম ভদ্রলোকের...

নিবারণ দত্ত। আমার বিশেষ বন্ধু। গিয়ে শুনে আসি, তিনি কি বলতে চান। ইতিমধ্যে তুমি একটা কাজ করবে।

বল?

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললেন না মৃগাঙ্ক। সিগারেট ধরালেন। ঘনঘন টান দিলেন কয়েকবার। গাঢ় কালচে হলদে রঙের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তাঁর মুখ। কপালে অনেকগুলি রেখার সৃষ্টি হল, আবার সরল হল।

হাতের কাছে অ্যাস্ট্রে ছিল না। ঘরের মেঝেয় ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, এক সোরাই জল ভরে এনে কেউ যদি বারংবার খেতে থাকে, তাহলে সোরাই শেষ হতে বেশি সময় নেবার কথা নয়। তেমনি ব্যাঙ্কে যতই কারুর টাকা থাক না কেন, এন্তার চেক কেটে গেলে জমানো অঙ্ক একদিন শেষ হবেই। তুমি জান, আমার ব্যাঙ্ক ভর্তি টাকা ছিল। খরচ কি রকম করি, তাও তুমি দেখেছ।

তুমি আমায় কি একটা কাজ করতে হবে বলছিলে?

ভূমিকাটুকু সেরে না নিলে সে কথায় আসা যাবে না। ক্রমেই আমার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে আসছে, আমি এখনই সতর্ক হতে চাই। ব্যাঙ্ক আবার ভরে ফেলতে চাই। এ-বিষয়ে তুমি আমাকে আশাতীতভাবে সাহায্য করতে পার।

কিভাবে?

রূপের জালে কিছু বড়লোককে তোমায় ফাঁসাতে হবে।

কি বলছ তুমি!

মৃগাঙ্ক জানালা গলিয়ে সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিলেন, বর্তমানে আমার যা বলা উচিত—প্রশ্ন উঠতে পারে, তুমি আমার জন্যে এ-কাজ করবে কিনা। করতে যে তোমায় হবেই। তুমি নিশ্চয় ভুলে যাবে না, আমার অনুগ্রহে কলকাতার একটা লকারে তোমার ত্রিশ হাজার টাকা আছে। লকারের চাবি এবং ওই সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ও আমার হাতের মুঠোয়। টাকাটা সহজেই তুলে নিতে পারি, কিন্তু নেব না। তবে তুমি আমার কথা না শুনলে, কি হবে বলতে

পারি না।

নিজের মনের মধ্যেকার প্রবল উত্তেজনাকে দমন করতে করতে রক্তিমা বলল, আমি তোমার অবাধ্য হব, এ-কথা বলি নি।

মৃদু হেসে মৃগাঙ্ক বললেন, জানি অবাধ্য হবে না। অন্তত কিছুদিন নয়। দশ বছরের বন্ড তোমাকে দিয়ে আমি করিয়ে নিয়েছি। এখন বেশ কিছুদিন তোমাকে অনুগত হয়ে থাকতে হবে। এক এক সময় তোমার নিশ্চয় মনে হয়, ঝোঁকের মাথায় বণ্ডে সই করে দিয়ে অত্যন্ত বোকামির কাজ করেছ।

ও-কথা থাক, আমায় কি করতে হবে বল?

কয়েকদিন আগে দুজন ভদ্রলোক এসেছিলেন খাওয়া-দাওয়া করতে; বয়স্কজন হলেন মধুসূদন গুপ্ত। লোকটার অনেক টাকা আছে। তোমায় নিংড়ে নিতে হবে।

মধুসূদন গুপ্ত !!

একি বলছে মৃগাঙ্ক! সে কি ইচ্ছাকৃত ভাবে একথা বলছে? সে কি জেনে ফেলেছে তার মধুসূদনের মধ্যে একাকার সম্পর্কের বিষয়, না এটা নেহাৎই পরিকল্পনা? পরিকল্পনা মনে দানা বাঁধার পর মধুসূদনকে লুব্ধ করার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল?

একটা উত্যক্ত ভাব রক্তিমাকে অসম্ভব উতলা করে তুলল।

আমি পারব না।

পারবে না কেন?

একজন নতুন লোককে বশ করা শক্ত কাজ।

বলো কি! এ যে নতুন কথা শোনাচ্ছ আজ? পারতেই হবে তোমাকে। লোকটার বউ তার চোখে ধুলো দিয়ে অন্যের সঙ্গে প্রেম করত। আঘাত পাওয়া লোক। সেই আঘাতে সহজেই তুমি প্রলেপ লাগাতে পারবে। বেশি লোভ আমার নেই। হাজার বিশেক টাকা টেনে নাও, তারপর অন্য শিকারের সন্ধান দেখা যাবে।

কিন্তু…

কোন কিন্তু নয়। একটা বিষয় তুমি ভেবে দেখছ না, আমার

যেমন আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে, তোমার তেমনি যৌবন ফুরিয়ে আসছে। তারপর কি হবে? যাতে কিছুই না হয়, সেই চেষ্টা আমি করছি। এই পরিকল্পনাকে ক্রমাগত সুষ্ঠু রূপ দিতে পারলে, বছরখানেকের মধ্যেই আমরা লাখ দেড়েক টাকা সংগ্রহ করতে পারব। বাকি জীবন আমাদের দুজনের পায়ের ওপর পা দিয়ে কাটিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে।

সবই বুঝলাম। আমি শুধু ভাবছি···

কিভাবে তার কাছাকাছি পৌঁছোবে। আমি এখুনি তাকে ফোন করে বলছি, সন্ধ্যার সময় যেন একলা এখানে আসে, বিশেষ কথা আছে। সন্ধ্যায় এসে দেখবে আমি নেই, তখন—। মোট কথা হল, আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তুমি মধুসূদন গুপ্তর মাথাটা চিবিয়ে খাবে।

মৃগাঙ্ক ঘোষ পাশের ঘরে গেলেন ফোন করতে।

রক্তিমা চিন্তার আগুনে ছাই হতে লাগল। অতীতে তার জীবনে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে, হেলায় কাটিয়ে উঠেছে সে। কিন্তু আজকে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার সমাধান সহজে হবে বলে মনে হয় না।

হোটেলে ভিড় কিছু কমেছে। নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পেয়েছেন মালিক কাম ম্যানেজার দিলীপ মুখার্জি। ভিড় হালকা হাওয়ায় মধুসূদন গুপ্ত অন্য ঘরে চলে গেলেন। আজই তাঁর নতুন ঘরের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন দিলীপ। দ্রুত চোখে তিনি এখন হিসেবটা দেখে নিচ্ছেন। হিসেব দেখা হয়ে যাবার পর হাতে কোন কাজ নেই।

সশব্দে সাতটা বাজল দেয়াল-ঘড়িতে।

কাজ শেষ করে চোখ তুলতেই দিলীপ দেখলেন, আড্ডাবাড়ির কুমার বাহাদুর কাচের ভারি দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলেন। তাঁর একটু নুয়ে পড়া শীর্ণ চেহারা দামী ওভার কোটে ঢাকা।

তিনি এগিয়ে এসে খনখনে গলায় বললেন, কি করছেন

ম্যানেজার ?

এইমাত্র কাজ শেষ করলাম। আর কিছু করবার নেই। আপনি এসে পড়ে ভালোই হল। আসুন, আমার প্রাইভেট চেম্বারে।

নতুন কিছু আমদানী হয়েছে নাকি ?

হয়েছে বৈকি।

বস্তুটি কি ?

খাঁটি বারগাণ্ডি। চোরা-পথ দিয়ে ফ্রান্স থেকে আমার হাতে এসেছে।

খুশি হলেন কুমার বাহাদুর, আপনি মশাই কাজের লোক। কিছুক্ষণের জন্যে আপনার প্রাইভেট চেম্বারে যেতে হচ্ছে দেখছি। কিন্তু তার আগে একটা ইন্‌ফরমেশন দিন তো ?

বলুন ?

মৃগাঙ্ক ঘোষ নামে এক ভদ্রলোক প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় এখানে আসেন। আজ এসেছেন কি ?

না। তিনি লক্ষ্ণৌ গেছেন।

লক্ষ্ণৌ! কি বলছেন ?

ঘণ্টা তিনেক আগে আমি বাসস্টাণ্ডে গিয়েছিলাম একজনকে রিসিভ করতে। দেখলাম, তিনি রওনা হচ্ছেন।

প্রায় লাফিয়ে উঠলেন কুমার বাহাদুর। কাউণ্টারের কাছ থেকে কয়েক পা সরে গিয়ে দ্রুত গলায় বললেন, বারগাণ্ডি দিয়ে গলা ভেজান এখন আর হল না ম্যানেজার সাহেব। চলি। আরেক দিন আসছি। সবটুকু একাই শেষ করে ফেলবেন না যেন।—তিনি ছুটতে ছুটতে চলে গেলেন।

কুমার বাহাদুরের ভাবভঙ্গি দেখে দিলীপ মুখার্জি হতভম্ব।

অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ ঠাণ্ডা অনেক বেশি। সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছাদিত। কনকনে হাওয়া দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, যে কোন মুহূর্তে বরফ পড়া আরম্ভ হতে পারে। সিজিনে যা সম্পূর্ণ বিরল সম্ভাবনা। ঠাণ্ডার মধ্যেই কুমার বাহাদুর দৌড়তে দৌড়তে প্রায়

চলেছেন।

মৃগাঙ্ক ঘোষের বাড়ি যখন পৌঁছলেন, তাঁর সমস্ত শরীর তখন ঘামে জবজব করছে। হাঁপাচ্ছেন। অনভ্যাসে ফোঁটা। পুরোন কাশিটাও এই সময় আবার চাগিয়ে উঠল। কাশির দমক সামলাতে কয়েক মিনিট গেল। পকেট থেকে রুমাল বার করে কপাল ও ঘাড়ের ঘাম মুছলেন কুমার বাহাদুর। অপূর্ব সুযোগ পাওয়া গেছে। মৃগাঙ্ক ঘোষ লক্ষ্ণৌ গিয়ে চমৎকার সুযোগ করে দিয়েছে তাঁকে। আজ সমস্ত রাত এই বাড়িতেই থেকে যাবেন।

দরজার সামনে পৌঁছে কিন্তু তাঁকে হতাশ হতে হল, তালা লাগান। অর্থাৎ রক্তিমা বাড়ি নেই। এই কনকনে সন্ধ্যায় কোথায় গেল সে? চিন্তিত কুমার বাহাদুর দরজার কাছ থেকে সরে এলেন। বাগান পেরিয়ে রাস্তায় নামলেন। এদিকে আরেক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে। কুমার বাহাদুর যখন বন্ধ দরজার সামনে উপস্থিত হয়েছেন, সুকুমার তখন বাগানের গেটের সামনে পৌঁছেছে।

সে বাগানে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল, একজনকে দেখতে পেয়ে পিছিয়ে এল। কিছুদূর পিছিয়ে আসতেই আরেকজনের সঙ্গে ধাক্কা খেল সুকুমার। আবছা অন্ধকারের মধ্যে মধুসূদনবাবু ও সুকুমারের দৃষ্টি-বিনিময় হল। দুজনেই বিস্ময়ে হতবাক। কুমার বাহাদুর চলে না যাওয়া পর্যন্ত দুজনের মধ্যে কোন কথা হল না।

তুমি এখানে?—মধুসূদন আগে প্রশ্ন করলেন।

আমারও তো ওই একই প্রশ্ন।

আমি এসেছিলাম মৃগাঙ্কবাবুর সঙ্গে দেখা করতে।

চিবিয়ে চিবিয়ে সুকুমার বলল, আমি কেন এসেছি বলুন তো?

কেন?

মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে।

মেয়েটির সঙ্গে! কেন?

তার সঙ্গে আমার একটা বোঝা-পড়া হবে।

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না সুকুমার?

বুঝতে না পারারই কথা। প্রথম জীবনে আমার বুকে যে দগদগে ঘা সৃষ্টি করেছে, সেই রত্নাই হল আজকের রক্তিমা।

মধুসূদন হতবাক হয়ে গেলেন। কথাটা সম্পূর্ণ অচিন্ত্যনীয়। অথচ সুকুমারের উক্তিকে হেসে উড়িয়ে দেবার উপায় তো নেই। রেবার পক্ষে সমস্তই যে সম্ভব, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। গুম হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। শেষে বললেন, তোমার কি একবারও মনে হয় নি ওই রক্তিমা আমার স্ত্রী রেবা হতে পারে?

দ্রুত গলায় সুকুমার বলল, কি বললেন, আপনার স্ত্রী!

হ্যাঁ, সুকুমার; আমার স্ত্রী।

আমি···মানে···অবাক হয়ে যাচ্ছি।

তার কার্যকলাপে আমিই কি কম অবাক হয়েছি! যাক, তার সঙ্গে কি রকম বোঝাপড়া করতে এসেছিলে? বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছ বলে মনে হচ্ছে। তোমার হাতে ওটা কিসের বোতল?

বোতলটা লুকোবার ব্যর্থ চেষ্টা করে সুকুমার বলল, সিরাপের!—যে লোকটা এখান থেকে বেরিয়ে গেল, তাকে চেনেন আপনি?

না। রেবার কোন নতুন নাগর হবে!

মধুসূদন অগ্রসর হলেন—হোটেলের পথ ধরলেন তিনি।

সুকুমার অবসন্ন মনে দাঁড়িয়ে রইল।

কুমার বাহাদুর দ্রুত ফিরে এলেন নিজের বাড়িতে। রক্তিমাকে না পেয়ে বেশ হতাশ হয়েছেন তিনি। কোথায় আবার চরতে গেল সে। ওভার কোটের বোতাম খুলতে খুলতে ড্রইংরুমে প্রবেশ করতেই নিজের প্রশ্নের উত্তর পেলেন।

রক্তিমা সোফায় গা এলিয়ে বসে আছে। কুমার বাহাদুরকে দেখে সে বলল, কোথায় ছিলেন? আমি প্রায় এক ঘণ্টা এখানে বসে আছি।

কুমার বাহাদুর নিজের খনখনে গলাকে আপ্রাণভাবে নরম করবার চেষ্টা করে বললেন, এদিকে আমি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি বুলবুলি।

মৃগাঙ্ক ঘোষের. সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে বলতে হবে। ক'দিনের জন্যে গেছে, বলে গেছে কি ?

ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আমি নিজের মনস্থির করে ফেলেছি।

অর্থাৎ...

ঘোষের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হয়েছে, আমি আপনার কাছে চলে এসেছি।

কুমার বাহাদুর লাফিয়ে উঠলেন, বল কি! তোমাকে সম্পূর্ণ নিজের করে পাব, এ যে আমি ভাবতেই পারছি না। কিন্তু বণ্ডের কি হবে ? ঘোষ যে তোমাকে দিয়ে বণ্ড লিখিয়ে নিয়েছে ?

এখান থেকে চলে গেলে কিছুই হবে না। ঘোষ কি ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গা আমাকে আতিপাতি করে খুঁজবে ভেবেছেন ? সে ধৈর্য তার নেই। কালই আমায় কোথাও নিয়ে চলুন।

সবই বুঝলাম। তবে...

অবাক হয়ে রক্তিমা বলল, আপনি ইতস্তত করছেন কেন ? গত-কাল পর্যন্ত তো আমায় কোথাও নিয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত ছিলেন!

তা ছিলাম। তবে..., কুমার বাহাদুরের গলায় আগেকার সতেজ ভাব নেই। প্রায় চুপি চুপি তিনি বললেন, বণ্ড সম্পর্কে আমায় বিশেষভাবে ভাবতে হচ্ছে। কোন রকম আইনের খচাখচির মধ্যে আমি যেতে চাই না। তাছাড়া এইভাবে চলে গেলে লকারের ত্রিশ হাজার টাকার গয়না তোমার হাত-ছাড়া হয়ে যাবে।

যাক। আমি আরো কিছুদিন বাঁচতে চাই কুমার বাহাদুর দুজন লোক আমার পিছু লেগে রয়েছে। সুকুমারকে তো দেখেছেন আমার সেই প্রাক্তন প্রেমিক। সে আমার মুখ অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দিতে চায়। আর আছেন মধুসূদন গুপ্ত। শুনলে অবাক হবেন তিনি আমার স্বামী। চাবকে আমার পিঠ ফাটিয়ে দেবার জন্যে তিনি তৎপর হয়ে রয়েছেন। আর আছে মৃগাঙ্ক ঘোষের এক বিরক্তিকর প্রস্তাব। এই সমস্ত কিছুর হাত থেকে এখন একমাত্র আপনি

আমাকে রক্ষা করতে পারেন।

রক্তিমার প্রত্যেকটি শব্দে আকুল কাকুতি ছিল।

আড্ডাবাড়ির কুমার বাহাদুর গম্ভীর মুখে সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়ার রিঙ রচনা করবার কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বললেন, তুমি ব্যস্ত হয়ো না, সমস্ত পরিস্থিতিকে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখতে হবে! পথ একটা বেরুবেই। ও-কথা এখন থাক, আজকের এই সুন্দর রাত অনর্থক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বুলবুল। আমরা আর বোকামিকে প্রশ্রয় দেব না।—তিনি রক্তিমার দিকে অগ্রসর হলেন।

মৃগাঙ্ক ফিরে এলেন দিন দুয়েক পরে।

তার পরিকল্পনা মত এক পা-ও রক্তিমা অগ্রসর হয় নি জেনে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। সিলভার অ্যারো হোটেলে গিয়ে দুজনের সঙ্গে সাক্ষাত করবার কোন উৎসাহ বোধ করলেন না। বকাঝকা করলেন খানিক রক্তিমাকে। তারপর টেলিফোনের ডায়েল ঘুরিয়ে কার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলেন।

রক্তিমা একটা কথাও বলল না।

গুরুতর ঘটনাটা ঘটল দিন দুয়েক পরে।

মৃগাঙ্ক ঘোষের পাশের বাড়িটায় বাসা বেঁধেছেন এক সিন্ধ্রী পরিবার। বাড়ির কর্তার হাঁপানি আছে। রোগের জ্বালায় দু-চোখের পাতা এক করতে পারেন না, জেগেই কেটে যায় রাতের পর রাত।

টেবিল ল্যাম্পের আলোয় বই পড়ছিলেন। হঠাৎ মেয়েলী গলার তীক্ষ্ণ চিৎকার তাঁকে সচকিত করে তুলল। তিনি ডেকচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার আগেই দ্বিতীয়বার চিৎকার কানে এল। পাশের বাড়িতে গুরুতর কিছু ঘটেছে বলে তিনি নিশ্চিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে কারণ অনুসন্ধান করবার জন্যে ব্যস্ত হলেন।

কাউকে ডেকে তোলবার জন্যে পাশের ঘরে যাবার আগেই তাঁর বড়ছেলে এ-ঘরে এল—সেও শুনেছে চিৎকার। দুজনে গায়ে জামা-

কাপড় চাপিয়ে রাস্তায় নেমে এলেন। অন্যান্য বাড়ি থেকে আরো কয়েকজন বেরিয়ে এসেছিলেন। সকলে দেখলেন, অন্ধকারে ডুবে রয়েছে মৃগাঙ্ক ঘোষের বাংলো। আর কোন মানুষের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু বাইরের ঘরের খোলা দরজার পাল্লা দুটো আছড়ে আছড়ে পড়ছে হাওয়ার ঝোঁকে চৌকাঠের ওপর। সকলের মনে সন্দেহ জট পাকাতে লাগল।

চিৎকারে পাড়ার লোকের ঘুম ভেঙে গেল, অথচ বাড়ির দুজনের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না—সন্দেহের বিষয় বৈকি। কিন্তু কেউ সাহস করে খোলা দরজা দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে চাইলেন না। জল্পনা-কল্পনা চলল. শেষে স্থির হল, পুলিশে খবর দেওয়া হল যুক্তিযুক্ত।

থানা বেশি দূরে নয়, দুজন উৎসাহী ভদ্রলোক ছুটলেন থানার উদ্দেশ্যে। থানা ইনচাজ প্রথমে আসতে চান নি। চিৎকারটা কিছুই নয়, শোনবার ভুল হতে পারে। অনেক যুক্তিতর্ক অবতারণা করবার পর তিনি কয়েকজন কনস্টেবল নিয়ে ঘটনাস্থলে এলেন।

মৃগাঙ্ক ঘোষের নাম ধরে কয়েকবার ডাকাডাকি করা হল। কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ইন্সপেক্টর সকলকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে কনস্টেবলদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন। অন্ধকারের মধ্যে পথ করে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে তাঁকে টর্চের সাহায্য নিতে হল। প্রথম ঘরখানায় কেউ নেই। দ্বিতীয়টায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি থমকে দাঁড়ালেন।

থমকে দাঁড়ালেন না বলে, দাঁড়াতে গিয়ে দু'পা পিছিয়ে এলেন বললে বোধ হয় ঠিক বলা হয়। অভূতপূর্ব মর্মান্তিক দৃশ্য তাঁর চোখের ওপর ধরা পড়েছে। তিনি দেখলেন, একজন মহিলা মেঝের কার্পেটের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আছেন। তার মুখের মাংস কে যেন খুবলে নিয়েছে। দগদগ করছে—রক্তের মত লালচে কাথ গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

শুধু মর্মন্তুদ নয়, বীভৎস! দশ বছরের চাকরি-জীবনে ইন্সপেক্টর

এ-রকম দৃশ্য দেখার সুযোগ পান নি। হকচকিয়ে গেলেন—অবশ্য পরমুহূর্তে তিনি নিজেকে প্রকৃতিস্থ করলেন। টর্চ ঘুরিয়ে আলোর সুইচবোর্ড খুঁজে বার করলেন। আলো জ্বাললেন। আলোয় ঘর ভরে যাবার পর তিনি বুঝতে পারলেন, মহিলাটির দেহে প্রাণ নেই।

মুখের বীভৎস অবস্থার জন্যে যে মৃত্যু হয়েছে, তা মনে হল না ইন্সপেক্টরের। বুকের কাছের শাড়ির ওপর কালচে রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। দেখলে মনে হয়, ওখানে গুলি লেগেছে! পরীক্ষা না করে যদিও জোর দিয়ে কিছুই বলা যাচ্ছে না—গুলি লেগে থাকলে মৃত্যু ওতেই হয়েছে সন্দেহ নেই।

কিন্তু গৃহকর্তা কোথায়? এই মেয়েটিই বা কে? গৃহকর্তার অনুপস্থিতিতে বডি এখান থেকে নিয়ে যাওয়া সঙ্গত কিনা চিন্তা করে দেখলেন ইন্সপেক্টর। মনের মধ্যে নানা সন্দেহ ওঠা-নামা করতে লাগল। তিনি গৃহকর্তার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হলেন।

ভালো করে ভোর হয় নি তখনো।

সিলভার অ্যারো হোটেলের মালিক কাম ম্যানেজার দিলীপ মুখার্জি পাশ ফিরে শুলেন। অনেক রাত পর্যন্ত তিনি কাজে ব্যস্ত ছিলেন। শুতে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া এই সাত সকালে কোন কাজ থাকে না। কাজেই আরো ঘণ্টা আড়াই বিছানার উষ্ণতা উপভোগ করতে বাধা নেই। ওয়াড়-পরানো কাঁচা লোমের ভারি কম্বলটা ভালো করে টেনে নিলেন গায়ের ওপর।

মিনিট দশেক বোধ হয় কেটেছে,—দরজায় করাঘাত হল।

বিরস মুখে চোখ খুললেন মুখার্জি, কিন্তু উঠলেন না। দরজায় করাঘাত দ্রুত হল। আর উপেক্ষা করা চলে না। আগন্তুকের মুণ্ডপাত করতে করতে তিনি উঠলেন। ড্রেসিং গাউন গায়ে চাপিয়ে দরজা খুলে দিতেই একটি ভয়চকিত বয়ের মুখ দেখতে পেলেন তিনি।

কি চাই?

স্যার, পুলিশ এসেছে···

কপালে ভাঁজ পড়ল মুখার্জির। দ্রুত গলায় তিনি প্রশ্ন করলেন, পুলিশ! কেন—?

বলতে পারছি না স্যার। কোতওয়াল সাহেব আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

ঘর থেকে বেরিয়ে দিলীপ মুখার্জি পার্লারে এলেন। জনকয়েক কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করছিলেন ইন্সপেক্টর রাজবীর চৌহান। তাঁর মুখে অস্থিরতার ছাপ। ঘনঘন সিগারেট টানছেন।

দিলীপ মুখার্জিকে দেখে তিনি বললেন, আপনি বোধ হয় এই হোটেলের ম্যানেজার?

ওনার এবং ম্যানেজার দুই-ই। কি ব্যাপার বলুন তো ইন্সপেক্টর, এই শেষ রাত্রে আমার হোটেলে হানা দিয়েছেন?

অহেতুক কাউকে বিরক্ত করা আমাদের পেশা নয় মশাই। কাজেই এসেছি। সুকুমার রায় নামে আপনার কোন বোর্ডার আছে?

আছেন। আমি কিন্তু আপনার আগমনের উদ্দেশ্য এখনো বুঝতে পারি নি—

একটা খুনের তদন্তে এসেছি; ওই সম্পর্কে সুকুমার রায়কে আমার দরকার। ঘরখানা দেখিয়ে দিন।

অত্যন্ত উত্তেজনা বোধ করলেও মুখে কোন প্রশ্ন করলেন না মুখার্জি। এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, আসুন—

তাঁকে অনুসরণ করে পুলিশবাহিনী সুকুমারের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। দরজায় কয়েকবার জোরে জোরে ধাক্কা মারলেন রাজবীর। চোখ কচলাতে কচলাতে সুকুমার দরজা খুলে দিল। পুলিশ দেখে সে হতভম্ব।

ইন্সপেক্টর ঘরে প্রবেশ করলেন। প্রশ্ন করলেন গম্ভীর মুখে, আপনার নাম সুকুমার রায়?

হ্যাঁ।

রক্তিমা দেবী নামে কাউকে চিনতেন?

চিনতাম মানে…

মৃগাঙ্ক ঘোষের বাড়িতে আপনার যাতায়াত ছিল ?

বার দু-তিন গেছি। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এই ভোরবেলা এসে আমায় এই সমস্ত প্রশ্ন করছেন কেন ?

সমস্ত কিছু এখুনি বুঝতে পারবেন। তিনি খুন হয়েছেন। ক্রুট্‌লি মার্ডার্ড।

স্তম্ভিত হয়ে যায় সুকুমার। দরজার পাল্লা ধরে নিজেকে সামলে নেয় কোন রকমে। খুন হয়েছে! ঘটনা যে এতদূর গড়াবে, শুনেও বিশ্বাস করতে মন চায় না।

অসংলগ্ন গলায় সুকুমার বলল, খুন হয়েছে! আমি তো···

বুকে গুলি লেগেছে ভদ্রমহিলার। তাছাড়া হত্যাকারী অ্যাসিড দিয়ে মুখ পুড়িয়ে দিয়েছে।

তাই নাকি! কি ভয়ানক! কিন্তু আপনারা আমার কাছে কেন এসেছেন বলুন তো ?

রাজবীর চৌহান কথা বলছিলেন আর খুঁটিয়ে দেখছিলেন সুকুমারকে। ভোরের কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যেও বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে কপালে। মুখের প্রতিটি রেখায় যেন নার্ভাস্‌নেস্‌।

তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, আপনাকে থানায় যেতে হবে।

কেন, আমায় থানায় যেতে হবে কেন ?

আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে। ওই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আপনি জড়িত বলে আমরা সন্দেহ করছি।

হাউ ডেয়ার ইউ ইন্সপেক্টর···!

সুকুমার ঘরের মধ্যে কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

একজন ভদ্রলোককে অযথা হয়রান করবার অধিকার আইন আপনাকে দেয় নি···

আইনকে সঠিক পথে চালিত করাই হল আমাদের কর্তব্য। নিজের কর্তব্য সম্পর্কে আমি অত্যন্ত সচেতন। সময় নষ্ট করে কোন লাভ নেই। যেতে আপনাকে হবেই। আপনার বক্তব্য থানায় গিয়ে বলবেন। আরেকটা কথা, আত্মপক্ষ সমর্থন করার সমস্ত রকম

সুযোগ-সুবিধা আপনাকে যথা সময় দেওয়া হবে। আসুন…

অসংখ্য প্রতিবাদ সুকুমারের মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল। একি অবিচার! দু-চারটে কড়া কথা শুনিয়ে দেবার দুর্বার লোভ সংবরণ করা কষ্টকর হয়ে উঠলেও নিজেকে সংযত করল সে।

আমি স্লিপিং ড্রেস বদলে নেবার সুযোগ পাব কি?

নিশ্চয়ই।

সুকুমার জামাকাপড় বদলে চৌহানের সঙ্গে থানায় গেল।

সেখানে গিয়ে বুঝতে পারল, তার অবস্থা সত্যিই সঙীন। মৃতদেহের পাশে তার ট্রেনের পাশ সমেত পার্সটা পড়েছিল। তাছাড়া সে যে ব্র্যাণ্ডের সিগারেট খায়, তারও একটা টুকরো পাওয়া গেছে। অ্যাসিডের ভাঙা বোতল পড়েছিল বাগানে। বোতলের গায়ে হাতের ছাপ আছে। তার সঙ্গে সুকুমারের হাতের ছাপ মিলিয়ে দেখা হবে। পুলিশের ধারণা, মিলে যাবে।

মনের মধ্যে আর জোর খুঁজে পাচ্ছে না সুকুমার। অসম্ভব ভয় করছে। পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্ত গড়ে উঠেছে। কে তাকে এই ভাবে জড়াল? রক্তিমার ওপর প্রতিশোধ নেবার স্পৃহা মনের মধ্যে উগ্র হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই; পরিকল্পনাও দানা বেঁধেছিল। কিন্তু…

নটার কিছু পরে ডি-এস-পি হেড কোয়ার্টার থেকে নৈনিতালে এলেন। অসংখ্য প্রশ্নে জর্জরিত করে তুললেন সুকুমারকে।

এক রকম চুপ করেই ছিল সুকুমার; শেষে বলল, আপনি মিথ্যে পরিশ্রম করছেন। আইনজ্ঞর সঙ্গে পরামর্শ না করে আমি কোন কথা বলব না। শুধু এইটুকু জেনে রাখুন, খুন আমি করি নি, ও সম্পর্কে কিছু জানিও না।

তিন দিন কেটে গেছে।

সুকুমারের চোখে ঘুম নেই। হাজতের মধ্যে অবিরাম পায়চারি করে চলেছে সে। কি কুক্ষণে নৈনিতালে এসেছিল বেড়াতে! আর

কি কুক্ষণে মৃগাঙ্ক ঘোষের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল! ঘোষের সঙ্গে আলাপ না হলে রক্তিমার সাক্ষাৎ পাওয়া যেত না। মনের মধ্যে দাউ দাউ করে আগুনও জ্বলে উঠত না তাহলে! এই বিপত্তির মুখোমুখি দাঁড়াতে হত না সুকুমারকে।

আর কয়েক দিনের মধ্যে কেস আরম্ভ হবে লক্ষ্ণৌ-এ। পুলিশ তার বিরুদ্ধে কেশ ভালোই সাজিয়েছে। প্রমাণগুলি হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়। মৃতদেহের পাশে পার্স পাওয়া ছাড়া, অ্যাসিডের ভাঙা বোতলের ওপরকার ছাপের সঙ্গে তার হাতের ছাপের অবিকল মিল হয়েছে।

আত্মীয় বান্ধবহীন বিদেশে এ ভাবে জড়িয়ে পড়ায় সুকুমারের এক এক সময় ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। পুলিশ-কর্তৃপক্ষ তাকে চিঠি লেখবার অনুমতি দিয়েছেন। প্রচুর চেষ্টা করেও সুকুমার বাড়িতে একছত্র লিখতে পারে নি। মা ও দাদাদের মনে কষ্ট দিতে তার বিবেকে বেধেছে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল।

সুকুমার এটুকু বুঝতে পেরেছে, নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে নিজেকে বাঁচানো যাবে না। চক্রান্তকারীকে প্রকারান্তরে সহযোগিতা করে যাওয়া হবে বলা চলে। কিভাবে তার ট্রেনের পাশ সমেত পার্স মৃতদেহের পাশে গেল, অ্যাসিডের বোতলে কিভাবে হাতের ছাপ পড়ল—এ-সমস্ত কথা ভেবে সময় নষ্ট করা আর বাঞ্ছনীয় নয়।

নিজেকে বাঁচাবার জন্যে কিছু করতে হবে—এখুনি কিছু করতে হবে।

অনেক চিন্তার পর সুকুমার দেখল, তিনটি বিষয়কে সামনে রেখে তাকে এগোতে হবে। প্রথম: একজন ভালো আইনজ্ঞ নিযুক্ত করা। দ্বিতীয়: যে কোন উপায়ে বেলের ব্যবস্থা করা। তৃতীয়: মোকদ্দমা চলাকালীন প্রাইভেট এন্‌কোয়ারী করিয়ে প্রকৃত হত্যাকারীর সন্ধান করা।

প্রাইভেট এন্‌কোয়ারী করানোর বিষয় মনে দানা বাঁধার একটি

বিশেষ কারণ আছে। সুকুমার জামালপুরের রেলওয়ে ওয়ার্কসপে কাজ করে। সাধন বন্দ্যোপাধ্যায় তার কলিগ নয়। কয়েক ধাপ ওপরে কাজ করে; কিন্তু দুজনের মধ্যে হৃদ্যতা আছে। সাধনের মুখে সে বহুবার ওর বাল্যবন্ধু প্রখ্যাত গোয়েন্দা বাসবের গল্প শুনেছে। বাসব যেবার জটিল এক খুনের তদন্ত নিয়ে জামালপুর এসেছিল, সাধনের মাধ্যমে আলাপ হয়েছিল সুকুমারের সঙ্গে। সামান্য আলাপ।

এই বিপদ থেকে বাসব তাকে উদ্ধার করতে পারে। ঠিকানা জানা নেই; আর জানা থাকলেও তার অনুরোধ রক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। সুতরাং সাধনের সাহায্য নেবে সুকুমার। কালবিলম্ব না করে দীর্ঘ এক চিঠি লিখল সাধনকে। নিজের বর্তমান সঙ্কটের কথা পরিষ্কার করে লিখল। এ-কথাও লিখল, এই সঙ্কট থেকে তাকে বাসব ছাড়া আর কেউ উদ্ধার করতে পারবে না। তাঁকে নিয়ে সাধন যেন অবিলম্বে চলে আসে। তার জীবনমরণ নির্ভর করছে সাধনের ব্যবস্থাপনার ওপর।

চিঠিখানা এক্সপ্রেস করে পাঠিয়ে দিল সুকুমার।

দুশো একচল্লিশের কে হ্যাঙ্গার ফোর্ড ষ্ট্রীটের ড্রইংরুমের দেওয়াল ঘড়িতে তখন সশব্দে আটটা বাজছে। বাসব সোফায় আড় হয়ে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল। এবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে, ম্যাগাজিন রেখে সোজা হয়ে বসল।

প্রায় দু-ঘণ্টা একই ভাবে বসে আছে এখানে। শুধু এখন নয়, এক সপ্তাহ অলসের মত সময় কাটিয়ে চলেছে ও। তদন্তে গিয়েছিল বহরমপুর। তদন্তের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে ফিরে আসবার পর হাতে কোন কাজ না থাকায় আলস্যের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়েছে।

শৈবাল থাকলে অবশ্য এত একঘেয়ে মনে হত না। গল্প-গুজবে সময় ভালোই কাটত। বর্তমানে সে কলকাতায় নেই, মেডিক্যাল

কনফারেন্স উপলক্ষ্যে হায়দ্রাবাদ গেছে। তার ফিরতে এখনো দিন পাঁচেক তো বটেই।

বাসব পাউচ থেকে মিক্সচার বার করে পাইপে ভরল। আজকাল সিগারেট ছেড়ে দিয়ে ও পাইপ ধরেছে। এই পরিবর্তন যে নিজের ইচ্ছায় হয়েছে, তা কিন্তু নয়। শৈবালের মুখ্য ভূমিকা ছিল।

সে হাসতে হাসতে বলেছিল একদিন, তোমার অভদ্রতায় সময় সময় আমি বেশ লজ্জা পাই।

বাসব সকৌতুকে উত্তর দিয়েছিল, সেকি ডাক্তার! সকলে তো আমায় ভদ্রতার অবতার মনে করে!

ওই আনন্দ নিয়েই থাকো। আমার অভিযোগ হল সকলের সামনে তোমার অভদ্রের মত সিগারেট খাওয়া নিয়ে।

তোমার আজগুবি অভিযোগ। আমি কি স্কুল-পালানো এপ্রেন্টিস সিগারেটখোর নাকি যে সকলের চোখ বাঁচিয়ে ধোঁয়া ছাড়ব!

তা নয়। তুমি হয়তো একজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সিগারেট বার করে নিজেই ধরালে, তাকে অফার পর্যন্ত করলে না। অথচ তুমি জানো যে ভদ্রলোক ধূমপায়ী। প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমার এই অসামাজিকতা আমি লক্ষ্য করে আসছি।

ঘর ফাটিয়ে হেসেছিল বাসব; হ্যাঁ, এই বদ অভ্যাস আমার আছে, স্বীকার করছি। সামনের লোককে অফার না জানিয়ে নিজে সিগারেট ধরানো অভব্যতা বৈকি! কি করা যায় বলো তো?

সিগারেট ছেড়ে দাও।

তা হয় না ডাক্তার। এতদিনের অভ্যাস…

আমি তোমাকে সিগারেট ছাড়তে বলেছি; ধূমপান করতে নিষেধ করি নি তো!

অর্থাৎ…

পাইপ ধরো।

পাইপ ধরব!

তোমার মত লোকের পক্ষে ওই ভালো। সিগারেটের মত পাইপ তো আর অফার করা চলে না। ধোঁয়া ছাড়াও হল, সামাজিকতাও বজায় রইল।

সেই থেকে বাসব পাইপ ধরেছে।

পাইপে ঘনঘন গোটা কয়েক টান দিয়ে বাসব বাহাদুরকে ডেকে কফি আনতে বলল। নাইট শোতে লাইট হাউসে যাবে কিনা চিন্তা করতে লাগল।

বাহাদুর তখনো কফি নিয়ে আসে নি, টেলিফোনের তীব্র ঝনঝনানি শোনা গেল। ভ্রূ কুঁচকে উঠল বাসবের। ট্রাঙ্ক-সিগন্যাল।

কে আবার ট্রাঙ্ককল করছে?

বাসব সোফা থেকে উঠে রিসিভার তুলে নিল।

অপারেটার জানাল, জামালপুর থেকে একজন কথা বলতে চান

হ্যালো…

বাসব…আমি সাধন…

বাই জোভ…কি খবর?

বিশেষ একটা অনুরোধ জানাব। ভরসা আছে তুমি আমাকে নিরাশ করবে না।

স্বভাব একটুও বদলালো না! ভনিতা না করে কি হয়েছে পরিষ্কার করে বলো।

আমার এক অতি পরিচিত ছেলে খুনের দায়ে জড়িয়ে পড়েছে হ্যালো…এখন তুমিই তাকে বাঁচাতো পারো—

ঘটনাটা কি?

আমি বিশদ ভাবে কিছু জানি না। ঘটনাটা ঘটেছে নৈনিতালে তার কাছ থেকে চিঠি পেয়েই তোমাকে ফোন করছি।

হ্যালো…সাধন, আমার একটু অসুবিধে হবে ভাই। একে নৈনিতাল, তায় আবার ডাক্তার এখানে নেই। তুমি তো জানো, একলা বাইরে বড় একটা আমি যাই না।

এড়িয়ে গেলে চলবে না, কেসটা তোমায় হাতে নিতেই হবে

নইলে একজন প্রমিশিং ছেলের জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। শৈবালবাবুর অনুপস্থিতির কথা তুলছো, আমি পাশে থাকলে তোমার কি বিন্দুমাত্র উপকার হবে না? পেমেন্টের কথা ভেবো না, তোমার দাবি সুকুমার নিশ্চয় পূরণ করতে পারবে।

বাসব দ্রুত চিন্তা করল। শুয়ে বসে সময় কাটছে কলকাতায়, কাজ নিয়ে নৈনিতালে কয়েক দিন কাটিয়ে এলে মন্দ হয় না।

হ্যালো···সাধন···পেমেণ্টটা সব সময় আমার কাছে বড় কথা নয়। বেশ, কেসটা নিলাম। সম্ভব হলে তুমি আজই নৈনিতাল রওয়ানা হয়ে যাও। আমি যাতে নির্বিঘ্নে তদন্ত চালাতে পারি, পুলিশের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তার ব্যবস্থা করে রাখবে। আমি কাল রওয়ানা হচ্ছি। ওখানকার ঠিকানা বলো?

তুমি আমার মুখ রাখবে জানতাম। তোমার কথা মতই কাজ হবে। ওখানকার সিলভার অ্যারো হোটেলে তোমার জন্যে ঘর বুক করে রাখব। ছেড়ে দিচ্ছি। গুডনাইট মাই ডিয়ার!

সাধন লাইন কেটে দিল।

বাসব হাই তুলতে তুলতে আবার সোফায় ফিরে এলো।

বাহাদুর সেণ্টার টেবিলের ওপর কফি রেখে গেছে।

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

নৈনিতালে পা দেবার ঘণ্টা তিনেক পরে বাসব সাধনকে সঙ্গে নিয়ে থানায় গেল। ইতিমধ্যে অবশ্য বেসরকারী তদন্তের অনুমতি নিয়ে রাখা হয়েছিল। রাজবীর সহজভাবে বাসবকে গ্রহণ করলেন বলে মনে হল না। তিনি বাসবকে নিজের বিপক্ষে বোধহয় দাঁড় করিয়েছেন।

সুকুমারকে তাঁরা হত্যাকারী হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। অথচ সেই ব্যক্তিকে নিরপরাধ প্রমাণিত করবার জন্যে বাসব এখানে এসেছে। সুতরাং বাসবের যতই খ্যাতি প্রতিপত্তি থাক না কেন,

তাকে সহজভাবে রাজবীর কখনই গ্রহণ করতে পারেন না। অবশ্য মৌখিক ভদ্রতা তিনি বজায় রেখে চলেছেন।

বাসব দাঁতে পাইপ চেপে পোস্টমর্টেমের রিপোর্টের ওপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিল। গুলি একটু বাঁ-দিক ঘেঁষে মাংস ভেদ করেছে। পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে যায় নি, রিবে আটকে ছিল। গুলি করা হয়েছে অন্তত হাত আষ্টেক দূর থেকে! গলায় গোটা কয়েক গভীর দাগ আছে—আঙুল দিয়ে চেপে ধরার দাগ।

অ্যাসিডের জন্যে মুখ সম্পূর্ণ গলে গিয়েছিল। চেনবার কোন উপায় ছিল না। অনুমান করা গেছে, গুলি না লাগলেও অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ভদ্রমহিলা ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে মারা যেতেন।

বাসব রিপোর্টটা টেবিলের ওপর রেখে রাজবীরের দিকে তাকিয়ে বলল, ভারতের নানা প্রান্তে অনেক জটিল রহস্যের সমাধান করতে আমাকে যেতে হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুলিশ কর্তৃপক্ষ আমাকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। আশা করি, আপনি তাঁদের পথ অনুসরণ করবেন।

গলা খাঁকারি দিয়ে ইন্সপেক্টর বললেন, উপরওয়ালাও আমাকে এই আদেশ দিয়ে রেখেছেন। কি ধরনের সহযোগিতা চান বলুন? তবে এটুকু বলতে পারি, অত্যন্ত সহজ কেস। নতুন করে আপনার কিছু করবার নেই।

সুকুমারবাবু যে হত্যাকারী—এ-সম্পর্কে আপনারা নিশ্চিন্ত?

ঘটনাটা আগাগোড়া শুনলে আপনিও আমার সঙ্গে একমত হতেন।

এই বন্ধুর মুখে মোটামুটিভাবে শুনেছি সব। সুকুমারবাবুর পার্স মৃতদেহের পাশে পড়েছিল, আপনাদের প্রথমে সন্দেহ হয় এই কারণে?

হ্যাঁ।

এমন তো হতে পারে, তাঁর ঘাড়ে দোষ চাপাবার জন্যে কেউ এই-ভাবে ব্যাপারটা সাজিয়েছে?

অবজ্ঞাসূচক একটা শব্দ করতে গিয়েও চৌহান নিজেকে সামলে নিলেন। বললেন, আমরা কাঁচা কাজ করি না মিস্টার ব্যানার্জি। অ্যাসিডের বোতলের গায়ে সুকুমারবাবুর হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। এটা নিশ্চয় অন্যের কারসাজি হতে পারে না?

পাইপ নিভে গিয়েছিল, ধরিয়ে নিল বাসব। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আপনাদের হাতে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে দেখা যাচ্ছে। ওয়েল ইন্সপেক্টর, মৃতদেহ আবিষ্কৃত হবার পর আপনি কি করলেন? জানবার অত্যন্ত আগ্রহ হচ্ছে।

আমার যা করা সঙ্গত, তাই করলাম। গৃহকর্তা মৃগাঙ্ক ঘোষের অনুসন্ধান করলাম। তাঁকে বাগানের বাউণ্ডারি-ওয়ালের পাশে পড়ে থাকতে দেখা গেল। রক্তাক্ত কপালে মূর্ছিত অবস্থায় তিনি ছিলেন। জলের ঝাপ্‌টা দিয়ে তাঁকে চাঙ্গা করে তুললাম। ঘুমন্ত অবস্থায় আক্রান্ত হওয়া ছাড়া, এখানে কিভাবে এলেন বলতে পারলেন না। আমি রক্তিমা দেবীর খুন হওয়ার কথা বলতে তিনি ভেঙে পড়লেন। মৃতদেহের পাশে পড়ে থাকা পার্সটা তাঁকে দেখালাম। ট্রেনের পাশে নাম লেখা ছিল। নাম শুনে মৃগাঙ্কবাবু সুকুমার রায়ের বর্তমান ঠিকানা বলে দিলেন। সিগারেটের টুকরোটাও চিনতে পারলেন তিনি! তারপর আমরা হোটেলে গিয়ে আসামীকে গ্রেপ্তার করলাম।

মৃগাঙ্ক ঘোষ নিজের আক্রমণকারীকে দেখতে পেয়েছিলেন?

না। বুকের ওপর প্রচণ্ড চাপ অনুভব করায় তাঁর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। অন্ধকারে চোখ সইয়ে নেওয়ার আগেই মাথায় আঘাত পান।

রক্তিমা দেবীকে খুন করার কি মোটিভ থাকতে পারে সুকুমার রায়ের, ভেবে দেখেছেন কি?

এর সহজ সমাধান তো চোখের ওপর রয়েছে—মেয়েটির চরিত্র ভালো ছিল না। নিশ্চয় সে প্রলুব্ধ করেছিল সুকুমারকে। তারপর কোন কারণে আমল দেয় নি। এসব ক্ষেত্রে যা হয়—আসামী ক্রুদ্ধ

হয়ে কাণ্ডটা ঘটিয়ে বসেছে।

আপনার অনুমান বোধ হয় ঠিক। আর বিরক্ত করব না। শুধু সুকুমারবাবুর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিন।

সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা হল।

বাসব অনেক সান্ত্বনা দিল সুকুমারকে। প্রশ্নের মাধ্যমে জেনে নিল সমস্ত ঘটনা। সুকুমার কিছু বাদ দিল না, মধুসূদনের সঙ্গে সাক্ষাত, মৃগাঙ্ক ঘোষের সঙ্গে আলাপ, তিনজনের ব্যক্তিগত জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী, রক্তিমাকে ভয় দেখানো ইত্যাদি সমস্তই বলে গেল। বাসব একাগ্র মনে শুনে যাবার পর বলল, আপনার পার্স দুর্ঘটনার স্থলে কিভাবে গেল, মনে করতে পারছেন ?

না।

কোথায় রাখতেন ?

ড্রেসিং টেবিলের দেরাজে।

অ্যাসিডের বোতলটা ?

খাটের তলায়।

এ-কথা কেউ জানতো ?

অ্যাসিডের বোতলের কথা কেউ জানত না। দেরাজে পার্স রাখতাম মধুসূদন জানতেন। হোটেলের ম্যানেজার আর মৃগাঙ্কবাবুও বোধ হয় ওখানে পার্স রাখতে দেখে থাকবেন।

সেদিন রাত্রে আপনি কোথায় ছিলেন ?

বিকেলে বেড়িয়ে ফিরি সাতটার সময় ; তারপর থেকে নিজের ঘরেই ছিলাম ভোর পর্যন্ত।

আচ্ছা মিষ্টার রায়, এই ব্যাপারে আপনার কাউকে সন্দেহ হয় ?

সন্দেহ ? কাকে সন্দেহ করব বলুন ? কে যে এইভাবে আমাকে বিপদে ফেলল ভগবান জানেন। মাঝ থেকে আমার কেরিয়ার গেল, আমিও গেলাম।

মনকে শক্ত করুন, ভেঙে পড়বেন না। নিরপরাধ হলে আপনাকে

নিশ্চিতভাবে বাঁচাতে পারব জানবেন।

সুকুমারের কাছ থেকে বাসব ও সাধন বিদায় নিল।

সুকুমারের কাছ থেকে ফিরে এসে কোন কথা বলে নি বাসব। খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় শুয়ে ধোঁয়ার জাল বুনে চলেছে। ওর মুখ দেখে মনে হয় গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছে।

বহু কষ্টে সিলভার অ্যারো হোটেলে এই ঘরখানা সংগ্রহ করেছে সাধন। সেও নিজের তল্পিতল্পা নিয়ে বাসবের সঙ্গে অবস্থান করছে। সাধন ঘুমিয়ে পড়ে নি, নিজের বিছানায় বালিশে ঠেসান দিয়ে আধ-শোয়া অবস্থায় বসে ঘনঘন নস্যি নিচ্ছে আর এধার-ওধার তাকাচ্ছে।

এক সময় বাসবের পাইপ নিভে গেল। আড়মোড়া ভাঙল ও।

সাধন বলল, কূল-কিনারা কিছু পেলে?

সকলের সঙ্গে কথা বলা আগে শেষ করি, তবে তো কূলের দিকে যাবার চেষ্টা করব। আমি যতদূর শুনেছি, তার মধ্যেকার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করছিলাম। আচ্ছা সাধন, তুমিও তো আমার সঙ্গে ছিলে, খুন সম্পর্কে তোমার অভিমত কি?

আমি তো চারধারে ঘন অন্ধকার দেখতে পাচ্ছি। তবে একটা কথা বলব, পুলিশ খুনের যে মোটিভ খাড়া করেছে, তা আমার জোরালো বলে মনে হচ্ছে না।

কারেক্ট! মজার কথা কি জান, এই ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে যা স্থূল বিষয়, তাকে সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বললে অবশ্য ঠিক হবে না। আমি বলতে চাই, পুলিশ ভাইটাল বিষয়টিকে আদপেই লক্ষ্য করে নি।

বিস্মিত গলায় সাধন বলল, তুমি কোন বিষয়কে মিন করছ?

বাসব বিছানায় উঠে বসল।—গুলি মারা এবং অ্যাসিড দিয়ে মুখ ঝলসে দেওয়ার কথা বলছিলাম।

ধরতে পারছি না তোমার কথা।

বুঝিয়ে বলছি। ধর, তুমি একজনকে খুন করতে চাও। তখন

তোমার প্রধান কাজ হল, যে-কোন অস্ত্র দিয়ে তার প্রাণ নেওয়া, নয় কি ? তুমি নিশ্চয় তার মুখ প্রথমে অ্যাসিড দিয়ে ঝলসে দিয়ে প্রাণ নেবে না। প্রাণ নেওয়াই যখন উদ্দেশ্য, তখন মুখ বিকৃত করে দেওয়ার অর্থ কি ? যদি ধরে নেওয়া যায়, তার মুখের চেহারা বীভৎস করে দেওয়াই তোমার উদ্দেশ্য ছিল। তবে প্রশ্ন উঠবে, তুমি তাকে গুলি মারলে কেন ? রক্তিমার মুখও বিকৃত করে দেওয়া হয়েছে, আবার গুলিও মারা হয়েছে—গুরুতর সন্দেহজনক ব্যাপার নয় কি ?

তাই তো !

দূর থেকে গুলি মেরে হত্যাকারা সরে পড়বে, তা নয় কাছে গিয়ে তার মুখে অ্যাসিড ফেলে এত কাণ্ডকারখানা করবার কি দরকার ছিল ?

কারণ আছে নিশ্চয়।

কারণ তো আছেই। আবার আরেকটা বিষয়ে চিন্তা করে দেখতে হবে, অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়েছিল আগে, না গুলি করার পরে।

এই সম্পর্কে তোমার অভিমত কি ?

নিশ্চিত অভিমত দেওয়া এই মুহূর্তে কষ্টকর। এটুকু বলতে পারি, এ ব্যাপারে কয়েক রকমের অর্থ হতে পারে। যেমন, যে কোন কারণেই হোক, হত্যাকারী চায় নি, খুন হওয়ার পর রক্তিমার আসল মুখ কেউ দেখুক। কিম্বা মুখ বিকৃত করে দিয়ে পুলিশকে ধাঁধায় ফেলেছে হত্যাকারী। ওই মৃতদেহটা হয়তো রক্তিমার নয়, অন্য কারুর !

সাধন হতবাক, বল কি !

কিছুই অসম্ভব নয়। আবার এমনও হতে পারে, আমি যা চিন্তা করছি প্রকৃত ব্যাপারের রূপ সম্পূর্ণ অন্য।

বাসব পাইপ ধরাল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, .অভিজ্ঞতা তো কম হল না। দেখেছি, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হত্যাকারীদের মনস্তত্ত্বে অদ্ভুত মিল। সত্যি কথা বলতে কি, অনেক ক্ষেত্রে এই মিলটুকু আমাকে পথ নির্দেশ করে দিয়েছে। দেখা যাক, এখানকার জল কতটুকু গড়ায়।

আজ পর্যন্ত কোন তদন্তে তুমি কি অসফল হয়েছ ?

না। আমার কাছে এ কিন্তু শ্লাঘার কথা নয়। চোখ-কান খুলে রাখলে যে কোন মানুষ, যে কোন তদন্তে সাফল্য লাভ করতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি। ও কথা যাক। সাধন, তোমাকে এখুনি একটা কাজ করতে হচ্ছে।

বল ?

হোটেলের ম্যানেজার—কি যেন নাম ভদ্রলোকের ? ডেকে নিয়ে এস তাঁকে একবার।

বেশ তো।

সাধন ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

বাসবের মত বিখ্যাত একজনকে বোর্ডার পেয়ে দিলীপ মুখার্জি বেশ গর্বিত ছিলেন। সাধন গিয়ে বলতেই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে তিনি ওপরে চলে এলেন।

বাসব তাঁকে বসতে অনুরোধ করে বলল, আপত্তি না থাকলে আপনার কয়েক মিনিট সময় আমি নষ্ট করব মিস্টার মুখার্জি।

ওভাবে বলবেন না। আপত্তি কিসের ?

গোটা কয়েক প্রশ্ন করতে চাই। প্রশ্নগুলি অবশ্য রক্তিমা দেবীর খুন হওয়া সম্বন্ধীয়।

দিলীপ মুখার্জি যেন থতমত খেলেন। ও বিষয়ে—আমি আর কি বলতে পারি। মানে···আমার তো কিছু জানবার কথা নয়!

আপনি নার্ভাস হবেন না মিস্টার মুখার্জি। আমি পুলিশের লোক নই, আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। তাছাড়া আমি এমন কোন প্রশ্ন করব না, যা আপনার জানা নেই।

বলুন ?

বাসব নিজের চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে বিলি কাটল। একটু চুপ করে থেকে প্রশ্নগুলো সাজিয়ে নিয়ে আরম্ভ করল, সুকুমার রায়কে আপনি সত্যি হত্যাকারী বলে মনে করেন ?

আমার মনে করাতে কি যায়-আসে বলুন? তবে ছেলেটিকে দিন পনেরো ধরে ক্রমাগত দেখে মনে হয়েছিল, সে শান্ত ও সংযত চরিত্রের।

তার মানে, সুকুমারকে আপনি হত্যাকারী হিসেবে ভাবতে পারছেন না। রক্তিমা দেবীকে চিনতেন?

না; নাম শুনেছিলাম।

কার কাছে নাম শুনেছিলেন?

আড্ডাবাড়ির কুমার বাহাদুর তার ওপর ইণ্টারেস্টেড ছিলেন।

ও! তিনি কোথায় থাকেন?

দিলীপ মুখার্জি আড্ডাবাড়ির কুমার বাহাদুরের পরিচয় দিলেন।

হুঁ। মৃগাঙ্ক ঘোষ সম্বন্ধে কি জানেন?

বেশি কিছু জানি না, ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার মুখ চেনাচিনি আছে। সুকুমারবাবু ও মধুসূদন গুপ্তর সঙ্গে গল্প-গুজব করবার জন্যে তিনি হোটেলে যখন-তখন আসতেন। বেশ অমায়িক লোক।

ওঁদের তিনজনের মধ্যে এত কি গল্প-গুজব হত, ও সম্পর্কে বোধ হয় কিছু বলতে পারেন না?

না মশাই।

বাসব পাইপ ধরাল।—আচ্ছা, এখানকার বাজার কেমন? টুরিস্টদের প্রলুব্ধ করার মত জিনিসপত্র ছাড়া অনেক আন্‌কমন জিনিসও পাওয়া যায় কি? ধরুন, আমি যদি এক বোতল অ্যাসিড কিনতে চাই।

বড় বড় শহরের মত বাজার এখানে নেই। একটা কাপড়-কাটা কাঁচি কিনতে চাইলে আপনাকে অন্যত্র যেতে হবে। সুকুমারবাবুরও এক বোতল অ্যাসিডের দরকার হয়েছিল, আমার একজন কর্মচারী লক্ষ্ণৌ থেকে তাঁকে এনে দেয়।

মধুসূদনবাবুর কিছু দরকার হয় নি?

দরকার···মানে···

কিছু লুকোবেন না দিলীপবাবু।

না, না, লুকোতে যাব কেন! আমি একটা রিভলবার সংগ্রহ করে

দিতে পারি কিনা মধুসূদনবাবু একদিন জানতে চাইছিলেন।

বলেন কি? রিভলবার! সে সময় কি তিনি খুব উত্তেজিত ছিলেন?

দিলীপ মুখার্জি বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে বললেন, উত্তেজিত বৈকি! আমি কাউন্টারে ছিলাম; অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায়—বলতে পারেন রাগে কাঁপতে কাঁপতে বাইরে থেকে এসেই আমাকে বললেন, আমাকে একটা রিভলবার সংগ্রহ করে দিতে পারেন? যা টাকা লাগে দেব। আমি তো অবাক। বললাম, আমি রিভলবার পাব কোথা থেকে? তিনি গলায় জোর দিয়ে বললেন, হোটেলের ব্যবসা করেন, চোরাই গুডসের আড়ত তো আপনাদের কাছে। দু-একটা আমেরিকান রিভলবার কি আর নেই? আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, কেউ জানতে পারবে না একথা। তাছাড়া আশাতীত টাকা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন।—তাঁর কথায় আমি অত্যন্ত বিরক্ত হলাম, এবং সিরিয়াস্‌লি জানিয়ে দিলাম নিজের অক্ষমতা।

মধুসূদন গুপ্তের সঙ্গে আপনার যখন কথা হচ্ছিল, সুকুমার রায় তখন কোথায় ছিলেন?

নিজের ঘরে। গুপ্ত হোটেলে প্রবেশ করবার মিনিট কয়েক আগে তিনি ফিরে এসে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলেন।

আমার প্রশ্নে আপনি অস্বোয়াস্তি বোধ করছেন বুঝতে পারছি, আর নয়। অনেক ধন্যবাদ!

দিলীপ মুখার্জি বললেন, না, না, সে-রকম কিছু নয়; আপনাকে সাহায্য করা তো আমার কর্তব্য।

ভালো কথা, মধুসূদন গুপ্ত কি হোটেলেই আছেন?

হ্যাঁ। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুলিশ তাঁকে এখানে থাকতে বলেছে। তাঁকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব কি?

তার দরকার হবে না; শুধু তাঁর রুম নম্বরটা বললেই চলবে।

তেইশ।

দিলীপ মুখার্জি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মুখে তিনি যাই বলুন

না কেন, বাসবের প্রশ্নের পর প্রশ্নে অস্বোয়াস্তি বোধ করছিলেন, এখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সুযোগ পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন যেন।

বাসব মৃদু হাসল।

এক টিপ নস্যি নিয়ে সাধন বলল, হাসলে যে?

দেখলে না, ভদ্রলোক প্রায় ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেলেন। তোমার কি মনে হয়, ভদ্রলোক সমস্ত সত্যি কথা বলে গেলেন?

সত্যি বলেই তো মনে হল। মধুসূদন গুপ্তর রিভলবার প্রার্থনা করাটা কিন্তু বেশ নাটকীয়।

নাটকীয় বৈকি! আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করেছ? পুলিশ রিপোর্টে বলা হয়েছে, দুবার চিৎকারের আওয়াজ প্রতিবেশীরা শুনতে পেয়েছে, গুলির শব্দের কথা কোথাও উল্লেখ নেই।

তাই তো!

নিঃসন্দেহে সাইলেন্সার ব্যবহার করেছিল হত্যাকারী, এবং তার লক্ষ্য অব্যর্থ, একটা সটেই সে কাজ সারতে পেরেছে।

সাধন নিজের পাওয়ারফুল লেন্সের চশমা নাকের ওপর থেকে নামিয়ে, মুছে আবার পরে নিল। স্বভাবতই সে যে-কোন ব্যাপারকে সিরিয়াস্‌লি গ্রহণ করতে অভ্যস্ত। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার পর থেকে চরম উত্তেজনা তার মনে সর্বদা বজায় রয়েছে।

মধুসূদন গুপ্তর সঙ্গে দেখা করবে নাকি?

নিশ্চয়। চল, সাক্ষাৎ পর্বটা এখুনি সেরে ফেলা যাক।

ওরা দুজন ঘর থেকে বেরুল।

ওদের ঘর থেকে তেইশ নম্বর ঘরের দূরত্ব বেশি নয়, সাতখানা ঘরের ব্যবধান মাত্র। নক্ করতেই দরজা খুলে দিলেন মধুসূদন। অসম্ভব গম্ভীর তাঁর মুখ। ক'দিন চুলে তেল পড়ে নি। সাজপোশাকে পারিপাট্য নেই।

বাসব নিজের পরিচয় দিল।

মধুসূদন দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি এসেছেন

আমি শুনেছিলাম। আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, তাও জানতাম। আসুন—

বাসব সাধনকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে বলল, আপনার স্ত্রীর এই মর্মন্তুদ মৃত্যুর জন্যে আমি মর্মাহত মিস্টার গুপ্ত।

মধুসূদন চমকে উঠলেন, আপনি···

আমি সমস্তই জানি; সুকুমারবাবু আমাকে বলেছেন। কি বিচিত্র পরিহাস, তাই নয় মিস্টার গুপ্ত? দীর্ঘদীন পরে জীবন অনিষ্টকারিণী স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত হল, এবং আপনার চোখের সামনে তিনি খুন হয়ে গেলেন।

চোখের সামনে!—গুপ্ত প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, না, না, একি বলছেন আপনি? আমার চোখের সামনে কিছুই ঘটে নি। আমি তো তখন এই ঘরে গভীর ঘুমে অচেতন ছিলাম।

আপনি কথাটা ধরতে পারলেন না। চোখের সামনে বলতে আপনার উপস্থিতিতে বোঝাতে চাইছিলাম। এখন আপনার মনে···

আমি ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে চাই না।

বাসব মৃদু হাসল। উপায় নেই; মৃতা আপনার স্ত্রী ছিলেন, সুতরাং ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে পড়বেই। সুকুমার রায়কে আপনি সত্যি খুনী বলে মনে করেন?

মধুসূদন অধৈর্য গলায় বললেন, অবান্তর প্রশ্ন! পুলিশের ওপর আমার আস্থা আছে, তাদের অনুমান ভুল হতে পারে না। দেখুন, বর্তমানে মনের অবস্থা ভাল নেই, আমি একলা থাকতে চাই।

আপনার শোচনীয় মনের অবস্থার কথা জেনেও আমি নিরুপায়। আরো গোটা কয়েক প্রশ্নের উত্তর না নিয়ে স্থান ত্যাগ করতে পারছি না। মিস্টার গুপ্ত, আমি শুনেছি, আপনি নাকি রিভলবার সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছিলেন?

সেকি! কে বললে?

দিলীপ মুখার্জি।

মধুসূদন গলা সপ্তমে চড়িয়ে বললেন, মিথ্যে কথা। আমি কেন

একথা মুখার্জিকে বলতে যাব? তাছাড়া আমি রিভলবার নিয়ে করবটা কি?—ওহো, খুনী ঠাওরেছেন আমাকেই? আপনার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়!

বাসব পাউচ থেকে মিক্সচার নিয়ে পাইপে ভরতে ভরতে বলল, ইমোশনাল হয়ে পড়বেন না মিঃ গুপ্ত। আমার যে কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তর আপনি ইচ্ছে করলে না দিতে পারেন। তবে এটুকু বলতে পারি, বিপদ তাতে আপনার বাড়বে। আপনাকে বুদ্ধিমান হিসেবে ধরে নেওয়া অন্যায় নয়। আমার কথার গূঢ় অর্থ আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

মধুসূদন নিজেকে সামলে নিয়েছেন। শান্ত গলায় বললেন, আমি দুঃখিত। বিশ্বাস করুন, প্রকৃত ঘটনার কিছুই জানি না আমি। রেবা, মানে আমার স্ত্রী—যাকে আমি মন থেকে ঝেড়ে ফেলেছিলাম—হঠাৎ এই নৈনিতালে তার নোংরা জীবন-যাত্রার পরিচয় পেয়ে মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছিল। দেখা করেছিলাম তার সঙ্গে। শাসিয়েছিলাম। চাবকে পিঠ লাল করে দিয়ে মনের ঝাল মেটাব বলেছিলাম। গিয়েও ছিলাম একদিন চাবুক নিয়ে। সুকুমারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওখানে। জানতে পারলাম, সে তার পূর্ব প্রণয়ীর মুখ অ্যাসিড দিয়ে ঝল্‌সে দিতে এসেছে। আমি আর ওখানে দাঁড়াই নি, চলে এসেছিলাম। তারপর শুনলাম রেবা মারা গেছে। এর বেশি আর কিছু জানা নেই।

সুকুমার কি আপনার সঙ্গে সেদিন চলে এসেছিলেন?

না।

মৃগাঙ্ক ঘোষকে আপনার কেমন লোক বলে মনে হয়?

যে কোন যৌবনবতীকে সে লোভের চোখে দেখতে অভ্যস্ত। আমি তাকে ঘৃণা করি।

হুঁ। এখন আমরা চললাম, পরে হয়তো আবার আপনার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ আসবে। এসো সাধন—

সাধনকে সঙ্গে নিয়ে বাসব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দিন দুয়েক কেটে গেছে বাসবের নৈনিতালে পা দেবার পর। ব্যস্ততা বেড়েছে অসম্ভব। ঘণ্টা তিনেক আগে হোটেল থেকে বেরিয়েছিল এক চাবিওয়ালার সন্ধানে। একলাই বেরিয়েছিল; সাধন হোটেলে ছিল। অবশ্য চাবিওয়ালার সন্ধান করবার আগে কিঞ্চিৎ প্রস্তুতি-পর্ব যে ছিল না, তা নয়।

গতকাল সন্ধ্যায় বাসব নিজের মনে পায়চারি করছিল; কি ভাবছিল ভগবান জানেন। জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকা ছাড়া সাধনের আর কিছু করবার ছিল না।

হঠাৎ বাসব বলে উঠল, তুমি বলতে পারো সাধন, নৈনিতালে ক'জন চাবিওয়ালা আছে?

সাধন আকাশ থেকে পড়ল, চাবিওয়ালা!

হ্যাঁ হে, যারা তালার চাবিটাবি তৈরি করে, তাদের কথা বলছি।

তোমার ভাই অদ্ভুত প্রশ্ন। এত বড় জায়গায় অসংখ্য চাবিওয়ালা আছে, তাদের সংখ্যা নির্ণয় করা কি সোজা কথা? লাইসেন্স হোল্ডার হলেও না হয় একটা কথা ছিল। ক'জন চাবিওয়ালা এখানে আছে জেনে তোমার কি উপকার হবে শুনি?

বিশেষ উপকার হবে। আমি অনেক ভেবে-চিন্তে এই সিদ্ধান্তে এসেছি; অবশ্য একগাদা চাবিওয়ালা আমার দরকার নেই। দরকার বিশেষ একজনকে। আমার অনুমান, এখানে গোটা তিনেকের বেশি চাবিওয়ালা নেই।

তোমার অনুমানের নিশ্চয়ই দৃঢ় ভিত্তি আছে?

দৃঢ় ভিত্তি বলতে যা মিন করছ, তা নেই স্বীকার করছি। তবে আমার অনুমানকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। নৈনিতাল বিখ্যাত এবং মোটামুটি একটা শহর হলেও স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা এখানে অত্যন্ত অল্প। এখানে লোক সমাগম হয় সিজিনে; শীত পড়ার মুখে আবার ফাঁকা। সুতরাং মাত্র তিন-চার মাসের জন্যে অসংখ্য চাবিওয়ালা এখানে ব্যবসা করতে আসতে পারে না। বিশেষে টুরিস্টদের ঘনঘন চাবি হারাবে, এমন সম্ভাবনা যখন নেই। বললাম

বটে তিনজন আছে, খোঁজ নিয়ে হয়তো দেখা যাবে একজনও নেই।

আমি বুঝতে পারছি না, তুমি চাবিওয়ালা-চাবিওয়ালা করে এমন ক্ষেপে গেলে কেন?

বুঝতে পারবে—ক্রমে ক্রমে সব বুঝতে পারবে। চলো, ম্যানেজারের কাছে যাওয়া যাক। তিনি হয়তো এ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারেন।

বাসবের প্রশ্ন শুনে কম অবাক হলেন না দিলীপ মুখার্জি। কোন গোয়েন্দার সংস্পর্শে আগে না এলেও তিনি শুনেছিলেন, তাদের কথাবার্তা সময় সময় একটু অদ্ভুত ধরনের হয়। মুখে বিস্ময়ের ভাব না ফুটিয়ে তিনি বললেন, এখানে কোন পারমানেণ্ট চাবিওয়ালা নেই। বছর দুই থেকে দেখছি সিজিনে একটা লোক লক্ষ্ণৌ থেকে আসে।

সাধনের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হেনে বাসব বলল, সেই লোকটা কোথায় থাকে বলতে পারেন?

তার আস্তানার সন্ধান আপনাকে দিতে পারব না, তবে কার্টার রোডের মোড়ে তাকে বসে থাকতে দেখি মাঝে মাঝে।

ধন্যবাদ মিঃ মুখার্জি। সাধন, তুমি ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করো, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঘুরে আসছি।

বাসব হোটেল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। ফিরে এলো এখন।

কিহে, চাবিওয়ালার সন্ধান পেলে?

পেলাম বৈকি; কার্টার রোডের মোড় আলো করে বসেছিল সে। প্রথমে কিছুই বলতে চায় না, পুলিশের ভয় দেখাতে বাছাধন স্বীকার করল, মোমের ছাপ দেখিয়ে একজন তার কাছ থেকে একটা চাবি তৈরি করিয়ে নিয়ে গেছে।

চাবি! কোথাকার চাবি? কে চাবি তৈরি করাল? আমি তো বুঝতে পারছি না!

বাসব এ কথার কোন উত্তর দিল না। অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়ে রইল জানালার বাইরে। সাধন বুঝতে পারল উত্তর পাবার সম্ভাবনা আর নেই।

ইতিমধ্যে মৃগাঙ্ক ঘোষ ও আড্ডাবাড়ির কুমার বাহাদুরের সঙ্গে বাসবের আলাপ হয়ে গেছে। কুমার বাহাদুরের ঠিকানা হোটেলের ম্যানেজারের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিল ও।

আহত মৃগাঙ্ক ঘোষকে হেল্‌থ সেণ্টার থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি নিজের বাড়িতে থাকবাব সুযোগ পান নি। পুলিশ বাড়ির দরজা সিল করে রেখেছিল। তিনি হোটেল অ্যাম্বাসাডারে উঠেছিলেন। বাসব গিয়েছিল সেখানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

বাসবের কথা তিনি পুলিশের কাছ থেকে শুনেছিলেন। একথাও শুনেছিলেন, ও আসবে নিজের প্রশ্নের তালিকা নিয়ে। সাধনের মনে হল তাদের দুজনকে দেখে মৃগাঙ্ক কিছু অপ্রসন্ন হলেন।

আলাপের প্রাথমিক পর্ব শেষ হবার পর বাসব বলল, আপনি আমাকে সমস্ত খুলে বলুন মিঃ ঘোষ···

মৃগাঙ্ক কনুইয়ের ভরে উঠে বালিশে ঠেসান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় বসে বললেন, এই হত্যাকাণ্ডের আমি কি জানি যে খুলে বলব? আমায় মেরে কে অজ্ঞান করে গেল তাই আমার জানা নেই।

হত্যাকারীকে যে আপনি স্বচক্ষে দেখেন নি, একথা মেনে নিতে বাধা নেই। তবে এমন হয়তো অনেক ছোটোখাটো কথা তুচ্ছ মনে করে আপনি পুলিশকে বলেন নি, যা তদন্তের সুবিধার দিক থেকে মোটেই তুচ্ছ নয়।

একটু ভেবে নিয়ে মৃগাঙ্ক বললেন, সেদিন সন্ধ্যা গাঢ় হবার পরই ফিরে এসেছিলাম সিলভার অ্যারো হোটেল থেকে। অল্প কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয়েছিল রক্তিমার সঙ্গে। তারপর খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ি। এর পরের ঘটনা পুলিশের মুখ থেকে শুনে থাকবেন।

কথাবার্তা বলার সময় রক্তিমা দেবীর কোন ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছিলেন?

ব্যতিক্রম···তা ধরুন···কথাবার্তা একটু অসংলগ্ন মনে হচ্ছিল। তাছাড়া···

থামবেন না, বলুন···

আমার মনে হয়েছিল সে নৈনিতাল ছেড়ে চলে যেতে চায়।

কিভাবে বুঝলেন?

আমি বাড়ি পৌঁছে দেখলাম, ও সুটকেশ গোছাচ্ছে। হঠাৎ অন্যায় ধরা পড়ে গেলে মানুষ যেমন থতমত খেয়ে যায়—আমাকে দেখে ওর অবস্থা ঠিক সেই রকম হল। এই সময় আমাকে আশা করা যায় না। আমার প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, সুটকেশটা এমনি গুছিয়ে রাখছে।

উত্তর আপনার মনঃপুত হয় নি?

না।

কেন?

মৃগাঙ্ক একটু হাসলেন। শ্লেষের হাসি।

রক্তিমা যে জাতের মেয়ে ছিল—কোন একটি পুরুষের অধীনে থাকা চিরকাল বোধ হয় সম্ভব হয় না তাদের পক্ষে। অবশ্য রক্তিমা আমার চোখে ধুলো দিতে চাইলে আইন তাকে আটকে রাখত।

অর্থাৎ—

মৃগাঙ্ক বণ্ডের ব্যাপারটা বললেন।

পাইপে মিক্সচার ভরা হয়ে গিয়েছিল বাসবের। এবার ধরিয়ে নিয়ে বলল, প্রয়োজনের সময় ও-বণ্ড কোন কাজেই লাগত না। এই বিরাট দেশে কোথায় খুঁজে বেড়াতেন তাঁকে? ওই ধরনের বণ্ড করিয়ে নিলে মনে সান্ত্বনা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনের সময় কার্যকরী করা যায় না কখনো।—একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, কিছু মনে করবেন না। এখানে আসবার পর রক্তিমা দেবীর কি কোন ইয়ে জুটেছিল?

সে বুঝতে না পারলেও আমি জেনে ফেলেছিলাম, তার সঙ্গে আড্ডাবাড়ির কুমার বাহাদুরের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল।

হুঁ। আচ্ছা, একথা কি আপনার মনে হয় নি, উনি স্যুটকেশ গোছাচ্ছিলেন কুমার বাহাদুরের সঙ্গে পালিয়ে যাবার জন্য ?

কথাটা শুনে মৃগাঙ্ক উত্তেজিত গলায় বললেন, হতে পারে। কি আশ্চর্য, এ-কথা তো আমার আগে মনে হয় নি। আপনি ঠিকই বলেছেন। নইলে···কিন্তু···

তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বাসব বলল, আপনাকে আর বিরক্ত করব না মিঃ ঘোষ, অনেক সাহায্য করেছেন। চলি এবার—

বাসব ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সাধনও।

রাস্তায় এসে সাধন প্রশ্ন করল, হোটেলে ফিরবে তো ?

না। আমাদের আরেকবার কুমার বাহাদুরের বাড়ি যেতে হবে।

আবার !

হ্যাঁ, নতুন করে তাকে বাজিয়ে দেখতে চাই।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই দুজনে আড্ডাবাড়ি হাউসে এসে পৌঁছাল। কুমার বাহাদুর হুইস্কির বোতল সামনে রেখে বসেছিলেন। নেশার ব্যাপারে তাঁর কোন বাঁধা-ধরা সময় নেই। ওদের দুজনকে দেখে তাঁর মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না।

পার্লারেই বসেছিলেন। বেতের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে খনখনে গলায় বললেন, আসুন, আসুন, কি সৌভাগ্য আমার, আবার আপনাদের দেখা পেলাম···

এত তাড়াতাড়ি দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু একটা নতুন সূত্র হাতে এসে পড়ায় চলে এলাম। রক্তিমা দেবী সম্পর্কে গোটা কয়েক স্পষ্ট প্রশ্ন করতে চাই, কিছু মনে করবেন না। হোটেল-ম্যানেজারের মুখে আমি শুনেছিলাম, আপনার মৃতার সম্পর্কে ইণ্টারেস্ট ছিল। আগের সাক্ষাতে এই কথা তুললে আপনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই কিছুক্ষণ আগে শুনে এলাম— ম্যানেজারের কথা অভ্রান্ত। এবার আপনার মুখে শুনতে চাই আসল কথাটা···

কুমার বাহাদুর উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। দ্রুত হাতে গেলাসের তলানিটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে তীব্র খনখনে গলায় বললেন, মৃগাঙ্ক ঘোষ আমার বিরুদ্ধে আপনাকে বলেছে, তার এত সাহস?

ভুলে যাবেন না, দিলীপ মুখার্জিও বলেছেন…

মুখুজ্যের কথা বাদ দিন। তার হোটেলেই তো গত বছর এই রক্তিমাকে নিয়ে কেলেঙ্কারীর একশেষ হয়ে গেছে!—তাজ্জব ব্যাপার! দুনিয়া শুদ্ধ লোক আমার পিছনে লেগে পড়ল কেন?

কেউ আপনার পিছনে লাগে নি। কথায় কথায় আমি জানতে পেরেছি। যাক, মূল প্রশ্নটা কিন্তু রয়েই যাচ্ছে। নেশার সময় ব্যাঘাত ঘটিয়েছি—যত তাড়াতাড়ি আমাদের বিদায় করে দেন, আপনার পক্ষে ততই ভালো কিন্তু।

নেশার আমার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। অ্যাল্‌কোহলের হাতছানি আমি সর্বক্ষণই পাই—বসে পড়লেই হল।

কথাটা শেষ করে একটু চিন্তা করে নিয়ে কুমার বাহাদুর আবার বললেন, রক্তিমা মৃগাঙ্ক ঘোষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। সুতরাং তার মত মেয়ের সঙ্গে আমার যদি সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাতে অন্যায়ের কি আছে?

বাসব নির্বিকার গলায় বলল, কিছু মাত্র অন্যায় নেই। আপনারা কি এখান থেকে চলে যাবার প্ল্যান করেছিলেন?

সে আমার সঙ্গে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল, আমি রাজি হই নি।

রাজি হন নি কেন?

আমি ফুর্তিবাজ লোক মশাই, প্রাণ ভরে ফুর্তি করলাম—হয়ে গেল। দায়িত্ব-টায়িত্ব ঘাড়ে নিতে আমার ভালো লাগে না। তাছাড়া আইনের মারপ্যাচও একটা ছিল। ভালো কথা, আপনাদের জিজ্ঞেস করাই হয় নি। চলে নাকি?

হুইস্কির বোতলের দিকে কুমার বাহাদুর অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

বাসব মৃদু হেসে বলল, আমরা ও-রসে বঞ্চিত। সিলভার অ্যারো হোটেলে গত বছর রক্তিমা দেবীকে নিয়ে কি কেলেঙ্কারী হয়েছিল

বলছিলেন ?

ও-জাতীয় মেয়েদের নিয়ে যা হয় আর কি !

ঘটনাটা বলতে আপত্তি আছে কি ?

বিন্দুমাত্র না। গত বছরও আমি এসেছিলাম এখানে। মৃগাঙ্ক ঘোষ ও রক্তিমাও এসেছিল। তখনই তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। ওরা উঠেছিল সিলভার অ্যারোতে। আলাপ হলেও তখন আমি এবারের মত রক্তিমা সম্পর্কে ইণ্টারেস্টেড ছিলাম না। বিনায়ক সেন তার রূপে মজলেন। দুজনের যখন বেশ জমে উঠেছে, তখন মৃগাঙ্ক টের পেয়ে গেল। এরপর যে কাণ্ড হল মশাই, তা বলে বোঝাবার মত নয়। হোটেলের লবিতে সমস্ত বোর্ডারের সামনে দুজনের মধ্যে প্রায় ডুয়েল হবার উপক্রম। সে এক বিশ্রী কাণ্ড ! তারপরই মৃগাঙ্ক মেয়েটাকে নিয়ে সরে পড়ল নৈনিতাল থেকে।

হুঁ। বিনায়ক সেনের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে ? কি করেন তিনি ? বয়স কত ?

দাঁড়ান, দাঁড়ান মশাই, এত প্রশ্ন এক সঙ্গে করবেন না, আমি একটুতেই বড় ঘাবড়ে যাই। অল্পই আলাপ হয়েছিল ভদ্রলোকের সঙ্গে। কলকাতায় ব্যারিস্টারি করেন। বয়স ধরুন, ষাট-বাষট্টির মধ্যেই।

আর আপনাকে বিরক্ত করব না, চলি। এস সাধন।

কুমার বাহাদুরের বাড়ি থেকে সোজা হোটেলেই ফিরল বাসব ও সাধন। বাসব অসম্ভব গম্ভীর, গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছে মনে হল। সাধনের মনে অজস্র প্রশ্ন ওঠা-নামা করলেও সে চুপ করে রইল। সাধন জানে, এখন উত্তর পাওয়া যাবে না।

কাউণ্টারেই দিলীপ মুখার্জি ছিলেন ; কথা বলছিলেন মধুসূদন গুপ্তর সঙ্গে। ওরা কাছে আসতেই বললেন, সেই কোন সাত-সকালে বেরিয়ে গেছেন, কোথায় গিয়েছিলেন ?

বাসব পকেট থেকে পাইপ ও পাউচ বার করতে করতে বলল,

কয়েকটা কাজ সেরে এলাম। থানা থেকে আমার খোঁজে কেউ এসেছিল নাকি ?

না।

মধুসূদন গুপ্ত চলে যাচ্ছিলেন , বাসব বলল, আপনি যাবেন না মিস্টার গুপ্ত, কথা আছে। আগে মিস্টার মুখার্জির সঙ্গে কথা শেষ করে নিই। কুমার বাহাদুরের মুখে শুনলাম, বিনায়ক সেন নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে নাকি এই হোটেলে মৃগাঙ্ক ঘোষের তুমুল ঝগড়া হয়েছিল গত বছর ?

ঠিকই শুনেছেন। এরকম বিশ্রী কাণ্ড আমার হোটেলে আর কখনও হয় নি। আমি তো ভেবেছিলাম, মিস্টার ঘোষ ওই ব্যাপারের পর আর কখনও নৈনিতালের পথ মাড়াবেন না।

সাধন বলল, আপনার অনুমান ঠিক হয় নি।

তাই তো দেখছি। এমন কি দিনের পর দিন তিনি এই হোটেলেও এসেছেন গল্প-গুজব করতে।

এরপর দিলীপ মুখার্জি ঘটনাটা বললেন—কুমার বাহাদুর যা বলেছিলেন সেই একই কথা।

বাসব পাইপ ধরিয়েছিল ; ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, বিনায়ক সেনের ঠিকানা জানেন ?

না। সারা বছর ধরে কত বোর্ডার আসছে, সকলের পার্মানেন্ট ঠিকানা মনে রাখা কি সম্ভব ?

তা বটে। আসুন মিস্টার গুপ্ত, ওপরে যাই।

সাধন ও মধুসূদনকে নিয়ে বাসব সিঁড়ির দিকে এগুলো। নীরবে অর্ধেক সিঁড়ি অতিক্রম করবার পর বাসব হঠাৎ বলল, মিস্টার গুপ্ত, আপনি রিভলবার পাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন কেন ?

আমি ?

তাই তো শুনলাম।

মধুসূদন আমতা আমতা করতে লাগলেন, না…মানে…আপনাকে বলল কে ?

কে বলল, সেটা বড় কথা নয়; সম্ভব হলে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

ও বুঝেছি, দিলীপবাবু বলেছেন। দেখুন, আমি···আসল কথা হল, রেবার জঘন্য জীবন-যাত্রা আমাকে পাগল করে তুলেছিল। আমি একটা রিভলবার সংগ্রহ করবার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিলাম, ওকে গুলি করে মারবার জন্য। কিন্তু বিশ্বাস করুন মিস্টার ব্যানার্জি, রিভলবার সংগ্রহ করতে আমি পারি নি, রেবার খুন সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

আরেকটা কথা, আপনি চাবিওয়ালার সন্ধান করছিলেন কেন? প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করবেন না। আপনার বয়ের মুখ থেকে কথাটা জানতে পেরেছি, আপনি তাকে চাবিওয়ালা ডাকবার কথা বলেছিলেন। কেন মিস্টার গুপ্ত?

আমার ঘরের চাবি হারিয়ে গিয়েছিল।

চাবি হারিয়ে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু আপনি চাবিওয়ালার অনুসন্ধান করলেন কেন বুঝলাম না, সে দায়িত্ব তো হোটেল অথরিটির। তারা আপনাকে ডুপ্লিকেট চাবি সাপ্লাই করত।

আমি ওঁদের কাছে চাবি চেয়েছিলাম, দিতে পারেন নি। কোন ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি নেই। এমন কি মাস্টার কী-ও না। তখন··· অবশ্য পরে আমি বারান্দা থেকেই কুড়িয়ে পেয়েছিলাম চাবিটা।

আর কোন কথা হল না, চুপচাপ তিনজনে সিঁড়ি অতিক্রম করবার পর মধুসূদন নিজের ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করলেন। সাধন এক টিপ নস্যি নিল। চিন্তিত বাসবের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলবার জন্য উসখুস করতে লাগল।

আরো কয়েক-পা এগুবার পর বাসব বলল, মনে হচ্ছে তুমি যেন কিছু বলতে চাও?

তুমি তো সর্বক্ষণ আমার সঙ্গে আছো, মধুসূদনবাবুর বেয়ারার সঙ্গে তোমাকে কথা বলতে তো দেখি নি।

কথা বলি নি তো।

তবে বললে যে!

ও-রকম বলতে হয়। আসলে চাবিওয়ালা যে চেহারার বর্ণনা দিয়েছিল, তাতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম মধুসূদন তার কাছে গিয়েছিলেন।

তাই বল। আচ্ছা বাসব, একটা বিষয় কিন্তু আমার কাছে অদ্ভুত লাগছে।

কোন্ বিষয়ে?

হোটেলের কোন ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি না থাকাটা একটু অদ্ভুত নয়? এমন কি মাস্টার কী-ও নেই!

এরকম অবস্থা কিন্তু অনেক হোটেলেই আছে। তোমাকে একটু বুঝিয়ে বলছি! ধর, বোর্ডার ঘর বন্ধ করে চাবি নিয়ে বেড়াতে গেলেন। এই অবসরে হোটেলের কোন কর্মচারি ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ঘর খুলে মূল্যবান জিনিসপত্র সরিয়ে নিল। এই ধরনের ঘটনা অনেক বড় বড় হোটেলে মাঝে-মধ্যে ঘটেছিল দেশের অনেক জায়গায়। স্বাভাবিক ভাবেই এই অবস্থার প্রতিবাদে আওয়াজ উঠেছিল। কাজেই ডুপ্লিকেট রাখার ব্যবস্থা অনেক হোটেল বাতিল করে দিয়েছে।

যাক, আমার এ-সমস্যাটা মিটলো।

তবু আমি ডুপ্লিকেটের বিষয়ে খোঁজ নিয়ে নেব। এখন আমি ভাবছি...

কি ভাবছ?

না, কিছু নয়।

তার মানে, বলতে চাও না। তোমার এই ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় আমার ভালো লাগে না। কত দূর কাজ এগুলো বলবে কি?

মৃদু হেসে বাসব বলল, এ তোমার রাগের কথা সাধন। তোমার চোখের ওপরই আমি তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি—তুমিই বল না, কেসটা বর্তমানে কি রকম স্টেজে রয়েছে?

সাধন ঘনঘন কয়েক টিপ নস্যি নিয়ে বলল, আমার ধারণায়

কেসটা বেশ জটিল হবে। সমাধানে পৌঁছবার জন্য তোমাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।

বর্তমানে আমার ধারণা কিন্তু ঠিক উল্টো। কেসটা মোটেই জটিল নয়। বরং বলতে পারি, বহুদিন এরকম সহজ কেস আমি হাতে পাই নি।

বল কি! এতই সহজ যদি তবে সল্‌ভ করে ফেলছ না কেন?

সহজ বলতে আমি যা বোঝাতে চেয়েছি, তা তুমি ধরতে পার নি। সহজ বলতে, আপাতদৃষ্টিতে এই হত্যাকাণ্ড যতই রহস্যজনক মনে হোক না কেন, অনুসন্ধান করে দেখার পর বুঝেছি তা নয়। হত্যাকারী নিজেকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রাখার জন্য আহামরি কিছু বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে নি। এমন একটা স্থূল কাজ সে করে ফেলেছে, যার জন্য এই রকম নাটকীয় হত্যাকাণ্ডের নায়ক হিসেবে তাকে আমার ভালো লাগছে না।

তার মানে, তুমি জান কে হত্যাকারী?

জানি বললে বেশি বলা হয়, আঁচ করেছি। আমি এখন ভাবছি, মোটিভের কথা। কোন্ মোটিভ তাকে প্ররোচিত করেছিল রক্তে হাত রাঙাতে? মোটিভ অবশ্য শেষ পর্যন্ত বেরুবেই। বুঝলে সাধন, কলকাতায় না গিয়ে অনুসন্ধানের কাজ যদি এখানেই শেষ হত, তাহলে আমি বলতে দ্বিধা করতাম না, এর চেয়ে কম সময়ে আর কোন কেস সল্‌ভ করতে পারি নি।

তুমি কলকাতা যাচ্ছ নাকি?

ওরা নিজেদের ঘরের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছিল; দরজার তালা খুলতে খুলতে বাসব বলল, কালই রওনা হতে হবে। দিন চারেকের মধ্যেই ফিরে আসতে পারব আশা রাখি।

বিস্মিত সাধন ওর পিছু পিছু ঘরে প্রবেশ করল।

বাসব কলকাতা চলে গেল।

সাধনকে বলে গেছে, চোখ-কান খুলে রাখতে। তাছাড়া

ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দেখা করেছিল। তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছিল, মৃগাঙ্ক ঘোষের বাড়ির আসবাবপত্র ও সামনের দরজার ওপর ফিঙ্গার-প্রিন্ট পেলে তুলে নিতে।

চার দিনের দিন বাসব কলকাতা থেকে ফিরল। তাকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। ওখানে এত সহজেই যে কার্যোদ্ধার করতে পারবে ভাবে নি। অবশ্য হোমিসাইড স্কোয়ার্টের মিঃ সামন্তর পূর্ণ সহযোগিতা না পেলে কিছুই করা সম্ভব হত না। পুলিশকে ভয় করে না এমন লোক বোধ হয় পৃথিবীতে নেই।

সাধন সতর্ক ছিল, কিন্তু চোখে পড়বার মত বিশেষ কোন ঘটনা সে লক্ষ্য করে নি। কুমার বাহাদুর একবারও আসেন নি হোটেলে। মৃগাঙ্ক ঘোষের সঙ্গেও সাক্ষাত হয় নি। মধুসূদন গুপ্ত এই ক'দিনের মধ্যে বার তিনেক হোটেল থেকে বেরিয়েছেন, কোথায় গেছেন সাধন তাব খোঁজ রাখে নি।

চোখ-কান খুলে থাকলেও বলতে গেলে এই ক'দিন তার সময় কেটেছে দিলীপ মুখার্জির সঙ্গে গল্প করে। ব্যবসাপত্র নিয়েই দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছে। আগেকার মত গত বছর থেকে আর ব্যবসা করতে পারছেন না বলে আক্ষেপ করেছেন মুখার্জি। রক্তিমাকে নিয়ে মৃগাঙ্ক ও বিনায়কের মধ্যে যে বিশ্রী কাণ্ড ঘটে—এরপর অনেক বোর্ডার হোটেল ছেড়ে চলে যান। সেই থেকেই মন্দা ব্যবসার সূত্রপাত।

কি মনে হওয়ায় সাধন হঠাৎ প্রশ্ন করেছিল, আপনাদের পরিচিতদের মধ্যে এখানে কার কার রিভলবার আছে বলতে পারেন?

আমার পরিচিতদের মধ্যে দুজনের রিভলবার আছে জানি। তার মধ্যে একজনকে আপিনও চেনেন, কুমার বাহাদুরের কথা বলছি।

সাইলেন্সার কি?

তা বলতে পারব না।

বাসব সোফায় ক্লান্তভাবে বসে পড়ে বলল, গতর একেবারে চূর্ণ হয়ে গেছে। বলতে গেলে ঝড়ের গতিতে কলকাতা গেলাম আর এলাম।

নস্যি নেবার পর সাধন প্রশ্ন করল, কাজ কিছু হল?

হল বৈকি? বলতে পারো, আমার অনুমান নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তোমার কি খবর বল?

সাধন ঘটনাহীন দিন কয়েকের বর্ণনা দিয়ে গেল।

ভাবছিলাম একটু বিশ্রাম করব, কিন্তু নষ্ট করবার মত সময় আর হাতে নেই। চল, আগে থানায় ঘুরে আসি, তারপর বিশ্রাম।

দুজনে থানার দিকে রওনা হল।

ইন্সপেক্টর অফিস ঘরেই ছিলেন; ওদের নিরুৎসুকভাবে অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর দু-চোখের তারায় অবজ্ঞা ঝিলিক্ দিয়ে উঠল। বললেন, কেসটার কিছু সুবিধা করতে পারলেন?

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, আপনার কি ধারণা?

আমার ধারণার কথা বাদ দিন। ভাল কথা, ইন্‌ফরমেশন সেক্ জানিয়ে রাখি, আগামী ৭ই অর্থাৎ চারদিন পরে কেস খুলবে আদালতে। এক দিন আগে সুকুমারবাবুকে আমরা এখান থেকে চালান দেব।

এখনও তো চারদিন সময় রয়েছে, এর মধ্যেই কাজ গুটিয়ে নিতে পারব।

আপনি কি বলতে চাইছেন মিস্টার ব্যানার্জি?

বাসব ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, আপাতত কুমার বাহাদুরের বাড়ি। তারপর মৃগাঙ্ক ঘোষের বন্ধ-বাড়িতে। ফিঙ্গারপ্রিন্টগুলো তুলেছিলেন কি?

হ্যাঁ; আপনাকে কপি দেব। কিন্তু···

পথে বলব সব। আসুন।

তিনজনে থানা থেকে বেরুল।

১

কুমার বাহাদুর পার্লারেই ছিলেন।

সামনের ছোট টেবিলটার ওপর হুইস্কির বোতল ছিল না। খালি গেলাসও নেই। দ্রুতহাতে কি লিখছিলেন তিনি। জুতোর শব্দে মুখ

তুলতেই তাঁকে প্রসন্ন বলে মনে হল না।

বাসব বলল, আপনাকে আজ আবার বিরক্ত করতে এলাম কুমার বাহাদুর।

কুমার বাহাদুর তাঁর খনখনে গলায় বললেন, এবার সত্যিই আমি বিরক্ত হচ্ছি। সময় নেই, অসময় নেই চলে আসছেন—এর মানে কি?

মানে না থাকলে কি আসি? নিরর্থক মানুষকে বিরক্ত করা আমাদের স্বভাববিরুদ্ধ কুমার বাহাদুর।—বাসব নির্লিপ্ত গলায় কথাটা বলল।

যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন, আমার কিছু কাজ আছে।

নিশ্চয়।

বাসব বসল। ইন্সপেক্টর ও সাধন অনুসরণ করল ওকে।

আপনার অনুমতি ছাড়াই বসলাম বলে কিছু মনে করবেন না। এবার কাজের কথা আরম্ভ করা যেতে পারে। আপনার রিভলবার আছে?

আছে।

মনে হল কুমার বাহাদুরের গলার আওয়াজ কেঁপে গেল।

একবার দেখান তো।

দেখাতে হবে?

প্রয়োজন না থাকলে দেখতে চাইতাম না।

একটু ইতস্তত করে কুমার বাহাদুর আসন ছেড়ে উঠলেন। ডিভানের ওধারে দেয়ালের গা ঘেঁষে যে কারুকার্য করা সেকেলে টেবিলটা রাখা ছিল, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। দেরাজ খুলে কি একটা বার করে নিয়ে আবার ফিরে এলেন তিনজনের কাছে। সাধন দেখল, তাঁর হাতে রিভলবারের বদলে রয়েছে রেক্সিনে মোড়া একটা সরু বই।

কুমার বাহাদুর বইটা বাসবের হাতে তুলে দিলেন।

সবিস্ময়ে বাসব বলল, একি?

রিভলবারের লাইসেন্স।

ইন্সপেক্টর একটু চড়া সুরেই বললেন, আমরা রিভলবারটা দেখতে চেয়েছি কুমার বাহাদুর, লাইসেন্সটা দেখাচ্ছেন কেন?

না…মানে…, কুমার বাহাদুর আমতা আমতা করতে লাগলেন।

কি হয়েছে বলুন তো? বাসব প্রশ্ন করল।

বিশেষ কিছুই হয় নি। মানে….

কিছু হয় নি যখন, রিভলবারটা দেখাতে এত আপত্তি কিসের?

এবার প্রায় মরিয়া ভঙ্গিতে কুমার বাহাদুর বললেন, রিভলবারটা আমার কাছে নেই, চুরি হয়ে গেছে।

চুরি!!!

তিনজনই হতবাক।

আপনারা বিশ্বাস করুন,—কুমার বাহাদুর আবার বললেন, সত্যিই আমার কাছ থেকে ওটা চুরি গেছে।

ইন্সপেক্টর বললেন, লাইসেন্সযুক্ত আগ্নেয়াস্ত্র হারানো দণ্ডনীয় অপরাধ একথা নিশ্চয়ই জানেন? কবে জানতে পেরেছেন, ওটা হারিয়েছে?

বেশ কয়েকদিন হল।

আমাদের খবর দেন নি কেন?

আমার তাই ইচ্ছে ছিল…কিন্তু…কেমন…

এসব ক্ষেত্রে ভয়কে জয় করাই বুদ্ধিমানের কাজ কুমার বাহাদুর। মনে করে বলুন তো, ওটা কবে চুরি গিয়েছিল। রক্তিমা দেবীর খুন হওয়ার আগে, না পরে?

বোধ হয় আগে—না, না, পরে·· পরেই মনে হচ্ছে।

কুমার বাহাদুর দিশেহারা হয়ে পড়েছেন, তাঁর খনখনে গলাকে এখন কেমন চেরা-চেরা মনে হচ্ছে, মানে…ব্যাপারটা কি জানেন, রিভলবারটা খুনের আগে কি পরে কবে চুরি গেছে আমার ঠিক জানা নেই। খুন হওয়ার দিন দুয়েক পরে আমি জানতে পারি।

বাসব বলল, ওই দেরাজেই থাকত অস্ত্রটা?

হ্যাঁ। নৈনিতালে পা দেবার পর থেকেই ওই দেরাজে আমি রিভলবারটা রাখতাম।

কাউকে সন্দেহ হয়?

কাকে সন্দেহ করব?

হুঁ। আপনার রিভলবারটা কত বোরের ছিল বলতে পারেন?

'৩৮ বোরের।

তাই নাকি! আপনাকে তাহলে জানিয়ে রাখতে হয়, '৩৮ বোরের গুলিই পাওয়া গেছে রক্তিমা দেবীর বডি থেকে।

অ্যাঁ!

কুমার বাহাদুরের করুণ মুখের দিকে এবার না তাকিয়ে বাসব বলল, আমাদের এখানকার কাজ শেষ হয়েছে। চলুন ইন্সপেক্টর, এবার ফেরা যাক। সাধন এবার সোফার মায়া ত্যাগ কর।

ও উঠে দাঁড়াল।

কুমার বাহাদুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনজন রাস্তায় নামল। পাইপের ধোঁয়া ছাড়ার ফাঁকে ফাঁকে বাসব গানের কলি ভাঁজছে।

আনন্দে ফেটে পড়ছ মনে হচ্ছে? সাধন প্রশ্ন করল।

ঠিক আনন্দ নয়। মানুষ ভয় পেলে, আমার ভালো লাগে।

ইন্সপেক্টর বললেন, মুখে যতই হম্বিতম্বি করুন না কেন, কুমার বাহাদুর ভয় পেয়ে গেছেন এটা ঠিক। কি রকম বুঝলেন? ওঁর কথা আপনার কাজে লাগবে নাকি?

প্রত্যেকের কথাই আমার কিছু না কিছু কাজে লাগছে ইন্সপেক্টর। চলুন, এবার একবার মৃগাঙ্ক ঘোষের বাড়ি যাওয়া যাক।

তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে··

ইন্সপেক্টরকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বাসব বলল, জানি, তিনি অন্যত্র আছেন। তাঁর সঙ্গে বর্তমানে আমার দেখা করবার ইচ্ছে নেই। আমি তাঁর বাড়িটা আরেকবার ভালো করে দেখতে চাই।

কুমার বাহাদুরের বাড়ি থেকে মৃগাঙ্ক ঘোষের বাড়ির দূরত্ব বেশি

নয়। তিনজন এসে উপস্থিত হল বাড়িটার সামনে। গেটের এক-ধারে দুজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুজনকে পাহারায় মোতায়েন করা হয়েছে বোঝা গেল। ইন্সপেক্টরকে দেখে তারা তটস্থ হয়ে উঠল।

গেট অতিক্রম করে, পকেট থেকে চাবি বার করতে করতে ইন্সপেক্টর বারান্দায় উঠলেন। তালা সীল করা ছিল। সীল ভেঙ্গে চাবি দিয়ে তালা খোলেন ইন্সপেক্টর, পিছু-পিছু বাসব ও সাধন বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল।

রিক্ততায় খাঁ খাঁ করছে। একটি অপূর্ব সুন্দরী নারীর জীবন-নাট্যের ওপর যবনিকা পড়েছে এখানে। সাধনের মনে হল রক্তিমার প্রেতাত্মা এই চার-দেয়ালের মধ্যেই অবিরাম দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চলেছে।

যে-ঘরে দুর্ঘটনা ঘটেছিল, বাসব তার দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ইন্সপেক্টরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার কি মনে হয়, এই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হত্যাকারী গুলি চালিয়েছে?

পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট অনুসারে ভিক্‌টিমের সঙ্গে হত্যাকারীর দূরত্ব ছিল হাত পাঁচেকের। উত্তরের জানালার ঠিক নিচে পড়েছিল মৃতদেহ। এখান থেকে জানালার দূরত্ব হাত পাঁচেকের বেশি হবে না।

বাসব ঘরটা পরীক্ষা করবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ না দেখিয়ে বললে, আজ সন্ধ্যায় এই ঘরে সকলকে উপস্থিত করতে পারেন?

সকলকে বলতে যদি সুকুমার রায়কেও বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে কিন্তু সম্ভব হবে না।

তাও তো বটে। বেশ, আপনার অফিস-ঘরে সকলকে জড়ো করুন। সুকুমার রায়কে ওখানে উপস্থিত করতে না পারার নিশ্চয় কোন কারণ থাকতে পারে না।

বেশ, তাই হবে। কিন্তু বারংবার এত জিজ্ঞাসাবাদ করবার কি অর্থ, আমি মোটেই বুঝতে পারছি না।

বাসব মৃদু হেসে বলল, আমার তদন্ত করার পদ্ধতি কিঞ্চিৎ বিরক্তিকর·ইন্সপেক্টর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি কূলে এসে নিশ্চিন্ত-ভাবে পৌঁছব জানবেন। এ প্রসঙ্গে অতীতের অসংখ্য নজীরের কথা নাই বা তুললাম। আপনি শুনলে নিশ্চয়ই খুশি হবেন, হত্যাকারীকে আমি জেনে ফেলেছি।

জেনে ফেলেছেন! সুকুমার রায়ই কি?

সাধন উত্তেজিত গলায় বলল, বল কি বাসব—কে সে?

এ-কথা এখন স্বচ্ছন্দে বলা চলে, সে আর যেই হোক, সুকুমার রায় নয়। ও-কথা থাক, তার চেয়ে সেই ভয়ঙ্কর রাতকে নিয়ে কিছু আলাপ-আলোচনা চালানো বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত।

ইন্সপেক্টরেব মনের মধ্যে উত্তেজনা পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল। তিনি বাসবের কথা বলার ভঙ্গিতে কিছু বিরক্তবোধও করছিলেন। কিন্তু প্রতিবাদ করবার উপায় নেই। এই লোকটির শক্তিমত্তার ওপর কর্তৃপক্ষের পূর্ণ বিশ্বাস আছে।

সেই রাতের বিষয় কি ধরনের আলোচনা আরম্ভ করতে চান?

ব্যাপারটা কিভাবে ঘটেছিল বলে আপনার ধারণা।

সে কথা তো আমরা আগেই জেনেছি, নতুন করে আলোচনার সূত্রপাত করে লাভ কি?—ইন্সপেক্টরের গলায় শ্লেষের আমেজ।

আছে। সমস্ত বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জেনে নিতে চাইলে, আলোচনাব প্রয়োজনীয়তা আছে। বাস্তবকে সব সময় উপেক্ষা করে চলবেন না ইন্সপেক্টার, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাতে ঠকতে হয়। আপনি চিন্তা করে দেখেছেন কি, গুলির শব্দে মৃগাঙ্ক ঘোষের ঘুম ভাঙে নি কেন? তাঁকে কি রক্তিমাকে খুন করবার আগেই আহত করা হয়েছিল? কিম্বা তিনি আমাদের যা বলেছেন, তা সম্পূর্ণ মনগড়া কাহিনী? আহত হয়ে পড়ে থাকাটা সাজান ঘটনা? এরপর আরো প্রশ্ন আছে। যেমন, মাঝ রাতে দরজা খোলা থাকবার কথা নয়। হত্যাকারীকে কে দরজা খুলে দিয়েছিল? রক্তিমা না মৃগাঙ্ক? মৃগাঙ্কই কি হত্যাকারী, না হত্যাকারীর সহযোগী? অথবা সম্পূর্ণ নির্দোষ

ব্যক্তি? হত্যাকারী কোন বিশেষ উপায়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকেছিল?

এতগুলি প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্বাভাবিকভাবেই ইন্সপেক্টর বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। পাইপটা অনেক আগেই নিভে গিয়েছিল। বাসব ধরিয়ে নিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তাঁর মুখের দিকে তাকাল।

সাধন তুমি কিছু বলতে পার?

ঘনঘন কয়েক টিপ নস্যি নিয়ে সাধন বলল, আমার মনে হয়, হত্যাকারীকে দরজা খুলে দিয়েছিল রক্তিমা। তারপর দুজনে মিলে গিয়ে মৃগাঙ্ককে আহত করেছিল। এবং...

হত্যাকারীর উদ্দেশ্য কি? রক্তিমাকে খুন করাই তার প্রধান উদ্দেশ্য। এত ঢাকঢোল পিটিয়ে সে মৃগাঙ্ককে আহত করতে যাবে না। অনেক চিন্তা করবার পর আমি এই বিষয়ের কনক্লুসানে এসেছি। আমার মনে হয়, সেরাত্রে মৃগাঙ্ক ঘুমিয়ে পড়ার পর রক্তিমা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। কেন বেরিয়েছিল, তা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। এই সম্ভাবনা হত্যাকারীর কাছে অজ্ঞাত ছিল না—ওৎ পেতে ছিল সে। রক্তিমা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার পরই, ভেজান দরজা ঠেলে সে ভেতরে ঢোকে। ভাল কথা, মৃগাঙ্ক ঘোষ যদি হত্যাকারী না হন, তাহলেই কিন্তু আমার এই থিওরি স্ট্যাণ্ড করবে। যা হোক, বাড়িতে প্রবেশ করে সে ঘুমন্ত মৃগাঙ্ককে আহত করল। তার বডিটা অন্যত্র ফেলে এসে অপেক্ষা করতে লাগল রক্তিমার জন্য। রক্তিমা ফিরে এসে হত্যাকারীকে দেখে নিশ্চয় অবাক হয়ে গিয়েছিল। তবে সে তখন চেঁচামেচি করে নি, কারণ আগন্তুক তার পরিচিত ব্যক্তি। দুজনের নিশ্চয় কথাবার্তা হয়েছিল। তারপর—হ্যাঁ, তারপরই অসতর্ক মুহূর্তে সে রক্তিমার গলা চেপে ধরেছিল। এই সময়কার আর্তনাদই শুনতে পেয়েছিল পাড়ার লোকেরা।

বাসব থামতেই সাধন বলল, এরপর বোধ হয় মুখে অ্যাসিড ছিটিয়ে দেওয়া হয়? এর উদ্দেশ্য কি বাসব?

উদ্দেশ্য জলের মত পরিষ্কার। সুকুমারবাবু ভয় দেখিয়েছিলেন

রক্তিমাকে অ্যাসিড দিয়ে মুখ পুড়িয়ে দেবেন, একথা কোনক্রমে জানতে পেরেছিল হত্যাকারী। তাঁর ঘাড়ে দোষ চাপাবার জন্যই সে অ্যাসিড ব্যবহার করেছিল। এ প্রসঙ্গের আলোচনা তো আমাদের মধ্যে বোধ হয় আগেই হয়েছে। এবার গুলি ছোঁড়ার কথায় আসা যাক। এই প্রসঙ্গে দুটো সম্ভাবনার কথা উঠতে পারে। প্রথম, গলা টেপা ও অ্যাসিড ব্যবহারের পরও তার সন্দেহ ছিল রক্তিমা মরে নি, তাই সে গুলি চালিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিল। দ্বিতীয়, কারুর ঘাড়ে দোষ চাপাবার এও আরেকটা পন্থা হতে পারে।

নিরস কণ্ঠে ইন্সপেক্টর বললেন, তদন্তের ক্ষেত্রে কল্পনাকে এত প্রশয় দেওয়া আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি না।

অসার কল্পনা ও বাস্তব ঘেঁষা কল্পনার মধ্যে পার্থক্য আছে, নিশ্চয় স্বীকার করবেন। যাক, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। এবার ফেরা যেতে পারে। আজ সন্ধ্যায় কিন্তু সকলকে আপনার অফিস-ঘরে একত্রিত করতে ভুলবেন না।

কথা শেষ করে বাসব ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

বিকেলের কিছু পরেই অন্ধকার ঘন হয়ে এল। নৈনিতালের সমস্ত দিনটা মনোরম—কিন্তু অন্ধকার ঘিরে আসবার পরই কেমন ছমছমে-ভাবের ছোঁয়া লাগে।

কেমন রহস্যময় হয়ে ওঠে নৈনিতাল। আজ আবার সমস্ত আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। কিছুক্ষণের মধ্যেই একত্রিত হয়ে অকাল বর্ষণ আরম্ভ করবে কিনা, বুঝতে পারা যাচ্ছে না। আকাশের দিকে তাকাতে তাকাতেই থানায় এলেন মধুসূদন গুপ্ত। ইন্সপেক্টর তাঁকে পূর্বাহ্ণেই এখানে আসবার কথা জানিয়ে রেখেছিলেন।

মধুসূদন অফিস-ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন, কুমার বাহাদুর, মৃগাঙ্ক ঘোষ ও দিলীপ মুখার্জি উপস্থিত রয়েছেন। কারুর মুখে কথা নেই, সকলেই কেমন নিরাসক্ত ভাব নিয়ে অপেক্ষা করছেন। ইন্সপেক্টরও আছেন ঘরে; নির্বিকার মুখে সিগারেট ফুঁকছেন তিনি। বাসব ও

সাধন এল ঠিক সাড়ে ছ'টার সময়।

বাসব সকলের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল, সুকুমারবাবুকে এবার এখানে আনতে পারেন ইন্সপেক্টর।

ইন্সপেক্টর দরওয়াজাকে ডেকে নিচু গলায় কি বললেন, দরওয়াজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল; এবং মিনিট দশেকের মধ্যেই সুকুমারকে নিয়ে ফিরে এল। সুকুমারের চেহারায় আগেকার জেল্লা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়েছে। সমস্ত মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়িতে পূর্ণ। দু-চোখের কোলে কালি। শ্রান্তভাবে একটা চেয়ারে সুকুমার বসল।

বাসব বলল, আপনারা সকলেই বিরক্ত বোধ করছেন বুঝতে পারছি। আপনাদের এইভাবে ডাকিয়ে আনানোর জন্য আমি মর্মাহত। অবশ্য এই ঘটনার আর যে পুনরাবৃত্তি হবে না, এ নিশ্চয়তা আমি এখুনি দিতে পারি। এবার কাজের কথা আরম্ভ করা যেতে পারে। আপনারা শুনলে নিশ্চয় আনন্দিত হবেন, আমি তদন্তের শেষপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছি। হত্যাকারী আমার চোখের ওপর আকার নিতে আরম্ভ করেছে। তবে সে যে কে এই মুহূর্তে নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। আপনারা আমায় যদি পূর্ণ সহযোগিতা করতেন, তাহলে এই গোলক ধাঁধায় ঘুরতে হত না।

বাসব থামল। সকলে নির্বাক।

ও আবার আরম্ভ করল, হত্যাকারীর কথা এখন থাক। ঘটনাটা কিভাবে ঘটেছিল, সেই আলোচনায় আসা যাক। একটা কথা আগেই জানিয়ে রাখতে চাই, কারুর চরিত্রকে কটাক্ষ করা কিন্তু আমার উদ্দেশ্য নয়। মৃগাঙ্ক ঘোষ উপযাচক হয়ে পরিচিত হলেন মধুসূদন গুপ্ত ও সুকুমার রায়ের সঙ্গে। দুজন বাঙালী সঙ্গী পাওয়া ছাড়া এইভাবে পরিচয় করার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল কিনা আমি জানি না। তিনজনের মধ্যে আলাপ বেশ জমে উঠল। মৃগাঙ্ক আমন্ত্রণ জানালেন দুজনকে নিজের বাসায়। ওখানেই রক্তিমার সঙ্গে সাক্ষাত হল মধুসূদন ও সুকুমারবাবুর। দুজনেই স্তম্ভিত। একজন নিজের স্ত্রীর সাক্ষাত পেলেন, আর অন্যজন দেখলেন তাঁর প্রেমিকাকে।

মৃগাঙ্কবাবু এ-সমস্ত বুঝতে পারলেন না। তবে···

ওকে থামিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় মৃগাঙ্ক বললেন, বলেন কি মশাই, রক্তিমা ওঁদের পূর্ব-পরিচিতা ছিল!

পরিচিতা শুধু নয়, মধুসূদনবাবুর স্ত্রী ছিলেন তিনি। বলা বাহুল্য এই সাক্ষাতের পর অতীতের ভুলে যাওয়া অনেক বিশ্রী ঘটনা খোঁচা-খাওয়া ঘায়ের মতই দগদগ করে উঠল। দুজনেই দুজনের অনুপস্থিতিতে দেখা করলেন রক্তিমা দেবীর সঙ্গে। সুখকর কথাবার্তা হল না, একথা সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায়। মধুসূদন বললেন, চাবকে পিঠ রক্তাক্ত করে তুলবেন ওই পণ্যা নারীর। সুকুমারের মন-বাসনা হল, ওই সুন্দর মুখ অ্যাসিড দিয়ে গলিয়ে দেবেন। রক্তিমা দেবীর পক্ষে ঘাবড়ে যাওয়া নিশ্চয় অস্বাভাবিক নয়। তিনি তাঁর নতুন নাগর কুমার বাহাদুরকে বললেন সব কথা। পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা হল। কিন্তু কুমার বাহাদুর পরিকল্পনা কার্যকরী করতে সাহসী হচ্ছিলেন না। কারণ একটা আইন-ঘটিত ব্যাপার হাইফেনের মত বিরাজ করছিল। মৃগাঙ্ক ঘোষ সতর্ক লোক, একটা বণ্ড সই করিয়ে নিয়েছিলেন প্রেমিকাকে দিয়ে। এই প্রসঙ্গে আরেকটা বিষয় বলে নেওয়া দরকার। গত বছরও এই সময় মৃগাঙ্কবাবু এখানে এসেছিলেন রক্তিমা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে। উঠেছিলেন আলাদা কোন বাসায় নয়, সিলভার অ্যারো হোটেলে। কলকাতার একজন বৃদ্ধ ব্যারিস্টারও তখন হোটেলের বোর্ডার। রক্তিমা দেবীকে কেন্দ্র করেই এক বিশ্রী ঝগড়া হয়ে গেল দুজনের মধ্যে। আপাতদৃষ্টিতে ওই ঘটনার সঙ্গে বর্তমান খুনের কোন সম্পর্ক নেই মনে হলেও—আমার ধারণায় দুটি ঘটনার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।

রক্তিমা খুন হলেন। দুর্ঘটনার স্থলে সুকুমারবাবুর পার্স ও তাঁর হাতের ছাপ সমেত ভাঙা অ্যাসিডের বোতল পাওয়া যাওয়ায় পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করল। এবার আপনাদের প্র্যাক্‌টিক্যাল দিকটা চিন্তা করে দেখতে অনুরোধ করি। সুকুমারবাবুকে এতটা বোকা মনে করা নিশ্চয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে না যে তিনি এত পরিকল্পনা করে

খুন করলেন, অথচ ঘটনাস্থলে ফেলে এলেন এমন সমস্ত স্থূল প্রমাণ, যাতে ফাঁসির দড়িকে বরণ করে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় রইল না। সুতরাং কি প্রতিপন্ন হচ্ছে? সুকুমার রায় হত্যাকারী নন। অন্য কেউ নিষ্ঠুর ভাবে রক্তিমা দেবীকে খুন করে দোষ চাপিয়েছে তাঁর ঘাড়ে। এখন প্রশ্ন উঠবে তাঁর বন্ধ ঘর থেকে হত্যাকারী কিভাবে পার্স ও অ্যাসিডের বোতল নিয়ে গেল? আমি অনুসন্ধান করে দেখেছি কোন ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি নেই। এমনকি মাষ্টার-কিও না। সুকুমারবাবু নিজের ঘরের চাবি কখনই হাতছাড়া করেন নি। এবার একটি মাত্র সম্ভাবনা বাকি রইল। হত্যাকারী নকল চাবি তৈরি করিয়েছিল। আমি সন্ধান করে এখানকার এক চাবিওয়ালাকে পাকড়ালাম। সে আমাকে জানিয়েছে, দুজন বাঙালি ভদ্রলোক সম্প্রতি তার কাছে গিয়েছিলেন চাবি তৈরি করানোর ব্যাপারে। ওই দুজনের মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছে। তিনি অবশ্য বলছেন, চাবি তৈরি করাতে গেলেও শেষ পর্যন্ত তৈরি করান নি। আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করি না। আমার সামনে এখন একটি মাত্র পথ খোলা আছে—চাবিওয়ালার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করা। এবং পুলিশের সাহায্যে তাকে আপনাদের সামনে এনে আইডেন্টি করানো, কে প্রকৃতপক্ষে চাবি তৈরি করিয়েছিল। কিন্তু মুশকিল দেখা দিয়েছে কোথায় জানেন? সেই চাবিওয়ালাকে এখন খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা।

আপনারা সমস্ত কথা শুনলেন। আপনাদের কেন ডাকিয়েছি, এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন বোধ হয়। দ্বিধাহীন ভাবে সহযোগিতা করুন। বুনো হাঁসের পিছনে কোথায় ছুটে বেড়াব? কারুর বিশেষ কোন কথা জানা থাকলে আমায় বলুন। তার সূত্র ধরে আমি এই রক্তাক্ত ঘটনার ওপর যবনিকা ফেলে দিই।

এতক্ষণ একটানা বলবার পর বাসব থামল। ওর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। মাঝে একবার দম নেবার প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করেছে বুঝতে পারা গেল। যাঁদের উদ্দেশ্য করে এত কথা বলা, তাঁরা কিন্তু

সকলেই নীরব রইলেন। কিছুক্ষণ শুধু ওয়াল ক্লকের শব্দ নীরবতাকে ভেঙে চলল।

শেষে—

আমি এবার যেতে পারি কি? কুমার বাহাদুরের খনখনে গলা শুনতে পাওয়া গেল।

আপনারা সকলেই যেতে পারেন। ইন্সপেক্টর বললেন, তবে আপনাদের সকলকেই সাবধান করে দিচ্ছি, নৈনিতালের বাইরে পা দেবার কেউ চেষ্টা করবেন না। বিশেষ করে কুমার বাহাদুর একথা স্মরণ রাখবেন।

আমি! আমার ওপর আপনার এই বিশেষ অনুগ্রহ কেন?

আপনার মালপত্র প্যাক হয়ে গেছে, ট্যাক্সি রিজার্ভ করবার জন্য আপনি অতি মাত্রায় তৎপর,—আমরা পুলিশের লোক, আমাদের সমস্ত সংবাদই রাখতে হয়। এখান থেকে চলে যাবার তাড়ায় আপনি একটা কথা ভুলে গেছেন, রিভলবার খোয়া যাওয়া আইনের চোখে বিরাট বড় অফেন্স। আপনাকে যে কোন মুহূর্তে আমি অ্যারেস্ট করতে পারি। অবশ্য আইন মেনে নেয় এমন উত্তর আপনি তাড়াতাড়িই দেবেন এ বিশ্বাস থাকায় আমরা আর জল ঘোলা করতে চাই নি।

কুমার বাহাদুরের শুকনো মুখ আরো শুকিয়ে উঠল।

সকলে যে যার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবার।

রাত দশটার পর বৃষ্টি নামল। অবিশ্রান্ত ধারায় নয়, টিপটিপ করে।

মেঘের মৃদুমন্দ ডাক থেকে থেকেই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। এত অন্ধকার নৈনিতালকে আগে বুঝি কখনো গ্রাস করে নি। মনে হচ্ছে ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করে কাটা যাবে।

বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কনকনে হাওয়া আরম্ভ হয়েছে। হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা সাপটে ধরেছে শৈলনগরীকে।

পেটা ঘড়িতে কোথায় সশব্দে বারোটা বাজল।

পথ নির্জন।

পথে চলা মানুষ তো দূরের কথা, একটা মোটর কারেরও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

সুখশয্যার আশ্রয়ে নৈনিতাল এখন সুপ্ত।

মাঝে মাঝে নাম না জানা নিশাচর পাখিরা ডেকে যাচ্ছে। এই সমস্ত দিনেই হায়নার দল তাদের নিরাপদ আশ্রয় থেকে বেরিয়ে শহরে আসে। কিসের সন্ধানে আসে কে জানে? তিমির পিঠের মত অ্যাসফ্যাল্টে মোড়া রাস্তাগুলোর ওপর দিয়ে ছুটোছুটি করে বেড়ানোর মধ্যেই বোধ হয় তাদের আনন্দ।

লেকের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা এঁকে-বেঁকে চলে গেছে বহু দূর—একজন সাইকেল আরোহীকে দেখা গেল সেখানে। শোচনীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ রাস্তার দু-পাশের অসংখ্য নিয়ন লাইটের আলোকে স্তিমিত করে রেখেছে। এই স্তিমিত আলোয় সাইকেল চালককে ভাল করে চেনা যায় না।

কালচে সবুজ রঙের অলেস্টারে তার সমস্ত শরীর ঢাকা। ফারের টুপি গলা পর্যন্ত নেমে এসেছে। সাইকেলের হ্যাণ্ডেল চেপে ধরা হাত দুখানা চামড়ার দস্তানায় মোড়া। লেকের পাশ দিয়ে কিছু দূর যাবার পর সে অন্য পথ ধরল।

ক্রমে নৈনিতালের অভিজাত বসতিকে ছাড়িয়ে এলো সাইকেল চালক। এধারে নিম্নবিত্তের লোকেদেরই বসবাস। সাইকেলের গতি এখন অনেক মন্থর। একটা ছোট্ট কাঠের ঘরের সামনে এসে সাইকেল থেকে সে নামল।

কাঠের ঘরটা শোচনীয় অবস্থায় কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে। কতকাল আগে এটা তৈরি হয়েছিল, তা অনুমান করা পর্যন্ত কঠিন। এই অঞ্চলে অসংখ্য এই ধরনের ছোট ছোট ঘর ছড়িয়ে রয়েছে। সাইকেল চালক সাইকেলটা একপাশে দাঁড় করিয়ে রেখে ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াল।

ঘরের মধ্যে থেকে আলোর রেশ বাইরে এসে পড়ে নি।

সাইকেল চালক কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। ঘরের মালিক ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে নিল বোধ হয়। তারপর এগিয়ে গিয়ে দরজায় চাপ দিল। খুলল না দরজা। ভেতর থেকে আঁটা। অবশ্য একটু জোরে চাপ দিলেই নড়বড়ে দরজার আগল ভেঙে পড়ত। সাইকেল চালক ও-পথ মাড়াল না।

পকেট থেকে লোহার বোনার কাঁটার মত কি একটা বার করে দরজার দুই পাল্লার মধ্যে চালিয়ে দিল। এরপর সহজেই খুলে গেল খিল। এভাবে ছাড়া যে দরজা খোলা যাবে না, এ সম্পর্কে সে আগে থেকেই নিশ্চিত ছিল বুঝতে পারা গেল। এবং ওখানে যে সে আগেও কয়েকবার এসেছে, এ সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

দরজা পেরিয়ে ঘরে এলো সাইকেল চালক।

একধারে ছোট একটা জলচৌকির ওপর নিবু-নিবু অবস্থায় প্রদীপ জ্বলছে। বাইরের হাওয়ার ঝাপ্টা ফাঁক-ফোকর দিয়ে ঘরে প্রবেশ করায় প্রদীপের এই অবস্থা। হাল্কা ভাবে কোন রকমে দেখা যাচ্ছে ঘরখানা। সাইকেল চালক চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল,—আসবাবপত্র যা আছে, সমস্তই দারিদ্র্যের পরিচায়ক। ঘরখানাও বিশেষ বড় নয়। আট ফুট বাই আট ফুট টেনেটুনে হলেও হতে পারে।

চৌকির ওপর জরাজীর্ণ কম্বল মুড়ি দিয়ে গৃহকর্তা শুয়ে রয়েছে। এক-পা এগিয়ে গিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে সেই দিকে তাকাল সাইকেল চালক। অলেস্টারের ডান দিকের পকেটে হাত চালিয়ে দিয়ে বার করে আনল রিভলবারটা। দ্রুত সেফটি ক্যাচ সরিয়ে নিল। তারপরই চাপা একটা যান্ত্রিক শব্দ...

পরমুহূর্তে ঝলসে উঠল গোটা কয়েক টর্চ। ঝটিতে ঘুরে দাঁড়াল সাইকেল চালক।

বাসব তখন প্রায় তার মুখোমুখি। হাল্কা গলায় বলল, নাউ ইয়োর গেম ইজ আপ মিঃ মুখার্জি!

টর্চের তীব্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল দিলীপ মুখার্জির। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে, পাকসাট খেয়ে তিনি ঘরের অন্য

প্রান্তে চলে গেলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আর কোন পথ আছে কিনা তার অনুসন্ধানে মরিয়া হয়ে উঠলেন। চমকে উঠে হাত থেকে রিভলবারটা পড়ে যাওয়ায় অনুশোচনা হতে লাগল। ওই মারণাস্ত্র হাতে থাকলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পথ সহজেই করে নেওয়া যেত।

বাসব দরজার গোড়ায় একা দাঁড়িয়ে নেই; ইন্সপেক্টর রয়েছেন, রয়েছে কয়েকজন কনস্টেবলও। তাছাড়া সাধন তো আছেই।

ও আবার বলল, আপনি পালাবার বৃথা চেষ্টা করছেন। পুলিশ ঘিরে রেখেছে ঘরখানা। আমার ফাঁদে আপনি পা দেবেন—এ সম্পকে আমি নিশ্চিত ছিলাম। সমস্ত আয়োজনই আমাকে করে রাখতে হয়েছে। যাকে চিরদিনের মত স্তব্ধ করে দেবার জন্য এত রিস্ক নিয়ে আপনি এখানে এসেছিলেন, একটা গুলিও খরচ করলেন, সেই চাবিওয়ালা কিন্তু ওই বিছানায় শুয়ে নেই। সে পুলিশের হেফাজতে নিরাপদে আছে। ওয়েল ইন্সপেক্টর, সিলভার অ্যারো হোটেলের মালিক কাম ম্যানেজার দিলীপ মুখার্জিকে এবার আপনি আসামী হিসেবে গ্রেপ্তার করতে পারেন।

চিৎকার করে উঠলেন দিলীপ, আমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই···

এক্সাইটমেণ্ট অনেক সময় মানুষকে হাস্যাস্পদ করে তোলে মিঃ মুখার্জি। সবচেয়ে বড় প্রমাণ আপনার হাত থেকে পড়ে যাওয়া রিভলবারটা। ওটা কুমার বাহাদুরের বাড়ি থেকে চুরি করেছিলেন। বঙ্কিমা দেবীর শরীর থেকে যে ·৩৮ বোরের গুলি পাওয়া গেছে, তা এই রিভলবার থেকে ছোঁড়া হয়েছে প্রমাণিত হবে। তাছাড়া একজন গরীব চাবিওয়ালার বিছানা লক্ষ্য করে কেন গুলি ছুঁড়লেন, তার সঠিক উত্তর দিতে পারবেন না। রাত অনেক হল—আমার কাজও শেষ। এবার আমরা হোটেলে ফিরব ইন্সপেক্টর। এসো সাধন—

ইতিমধ্যে ইন্সপেক্টর দিলীপ মুখার্জির হাতে হ্যাণ্ডকাপ পরিয়েছেন। মাটি থেকে রুমালে মুড়ে রিভলবারটা পকেটে পুরলেন এবার।

বাসব ও সাধন নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন ততক্ষণে। বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি অবিশ্রান্ত ধারায় রূপান্তরিত হল।

অমৃতসর মেলে জায়গা পাওয়া গেল না। ডাউন দুন এক্সপ্রেসে কলকাতার যাত্রী হয়েছে বাসব ও সাধন। সাধন অবশ্য কলকাতা পর্যন্ত যাবে না। গয়ায় নেমে গিয়ে জামালপুরের গাড়ি ধরবে। ওদের সঙ্গে মধুসূদনও চলেছেন। সুকুমারের এ যাত্রায় যাওয়া হল না। আইন ঘটিত সামান্য কিছু কাজ বাকি আছে। কাজ শেষ করে কয়েক দিন পরে সে ফিরবে।

জলে ভিজে বাসব ও সাধনের ঠাণ্ডা লেগে গেছে। মধুসূদন এই কামরাতেই রয়েছেন। চতুর্থ বার্থের অধিকারী হলেন একজন জাঁদরেল পাঞ্জাবী ভদ্রলোক।

সাধন কাচের শার্সিটা নামিয়ে দিয়ে বলল, এরকম ঠাণ্ডা আমার অনেকদিন লাগে নি! নিউমোনিয়া না হলে বাঁচি!

বাসবের ঠোঁটের আগায় জ্বলন্ত পাইপ ঝুলছে।

মুখ থেকে পাইপ না নামিয়েই ও বলল, নেহাৎ কপাল না ভাঙলে এত সস্তায় নিউমোনিয়া হয় না। বালিয়া আর কতদূর? ওখানে চা খেয়ে নিতে হবে।

মধুসূদন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, মিনিট কুড়ি সময় লাগবে আরো।—একটা প্রশ্ন ছিল মিঃ ব্যানার্জি!

বলুন?

এখনো বিশ্বাস করতে মন চায় না যে দিলীপ মুখার্জিই হত্যাকারী! আচ্ছা, আপনি কিভাবে ওঁর সম্পর্কে স্থানিশ্চিত হলেন?

আপনার এই ছোট্ট প্রশ্নটির উত্তর কিন্তু খুব ছোট্ট নয় মিঃ গুপ্ত!

না হোক,—সাধন বলল, তুমি আমাদের সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলো। মিঃ গুপ্ত ভালো প্রশ্নই তুলেছেন।

ঘন ঘন কয়েকবার পাইপে টান দেবার পর বাসব আরম্ভ করল: তদন্ত হাতে নেবার পর কিভাবে অগ্রসর হবো, প্রথমে ঠিক করে উঠতে

পারছিলাম না। তবে সুকুমারবাবু যে নিরপরাধ, এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত ছিলাম। কেন নিশ্চিত ছিলাম, সেকথা সকলের সামনে আমি বলেছি। কাজেই সন্দেহ করবার পাত্র রইলেন তিনজন: কুমার বাহাদুর, মৃগাঙ্ক ঘোষ ও আপনি মিঃ গুপ্ত। দিলীপ মুখার্জিকে সন্দেহ করবার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। রক্তিমা দেবীকে কিসের স্বার্থে তিনি খুন করবেন? বাকি তিনজনের স্বার্থ আমি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করে দেখলাম। এত'দনেব পোষা পায়রা ক্লাচের বাইরে চলে যাচ্ছে লক্ষ্য করে রাগে অন্ধ হয়ে মৃগাঙ্ক খুন করে থাকতে পারেন রক্তিমা দেবীকে। কুমার বাহাদুর আশা-ভঙ্গের বেদনায় ভুগছিলেন বোধ হয়। হাতের মুঠোয় সম্পূর্ণ পাচ্ছিলেন না লাস্যময়ীকে। তাঁর কামনাকে উসকেই সে চলে যাচ্ছিল অন্য পুরুষের কাছে। শেষে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে হয়তো এই অপকর্ম করে ফেলেছেন। মিঃ গুপ্তর ইস্যুটা আলাদা। তিনি স্ত্রীর এই কদর্য রূপ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর জীবনেব শনি এই নারী এখনও অসংখ্য পুরুষকে এক্সপ্লয়েট করে সুখে আছে লক্ষ্য করে তিনি মেণ্টাল ব্যালেন্স হারিয়েছিলেন। হয়তো এতদিনে তাঁর মেয়ে রিলির মৃত্যুর প্রতিশোধ এই ভাবে নিয়েছেন। এরপরই দুটো বিষয় আমার মনে খটকা জাগাল। আমি সচেতন হলাম দিলীপ মুখার্জি সম্পর্কে। অ্যাসিডের অভাব নেই বাজারে। যে কেউ লক্ষ্ণৌ থেকে ও জিনিসটা আনিয়ে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু সেই সমস্ত অ্যাসিডের বোতলে সুকুমারবাবুর হাতের ছাপ থাকবে না নিশ্চয়। কাজেই হত্যাকারী ও-পথে না গিয়ে তাঁর বোতলটা চুরি করে কাজে লাগিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছে। বন্ধ ঘর থেকে বোতল কিভাবে চুরি হল, যেক্ষেত্রে ডুপ্লিকেট চাবি হোটেলের ভাঁড়ারেও নেই? আর সন্দেহ রইল না হত্যাকারী নকল চাবি তৈরি করিয়েছিল। নৈনিতালের মত হিল স্টেশনে অসংখ্য চাবিওয়ালা থাকবার কথা নয়। আমি সহজেই সেই বিশেষ চাবিওয়ালার সন্ধান পেলাম। পুলিশের ভয়ে সে আমার কাছে স্বীকার করল, দুজন

বাঙালি লোক তার কাছে এসেছিল চাবি তৈরি করাতে। মধুসূদনবাবুর চেহারার বর্ণনা দিয়ে বলল, ইনি শেষ পর্যন্ত চাবি তৈরি করান নি। দিলীপ মুখার্জির চেহারার বর্ণনা দেবার পর জানাল, ইনি মোমের ছাপ এনে চাবি তৈরি করিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এবার আমি মুশকিলে পড়লাম মোটিভ নিয়ে। অন্যান্যদের খুন করার মোটিভ জলের মত পরিষ্কার। কিন্তু দিলীপ মুখার্জি রক্তিমা দেবীকে খুন করবেন কেন? দ্বিতীয়বার আমাকে যেতে হল কুমার বাহাদুরের কাছে। কথায় কথায় তিনি বললেন, গত বছর সিলভার অ্যারো হোটেলে রক্তিমা দেবীকে কেন্দ্র করে মৃগাঙ্কবাবু ও কলকাতার এক ব্যারিস্টারের মধ্যে বিশ্রী রকমের ঝগড়া হয়। আমি আলোর সন্ধান পেলাম। দিলীপবাবুকে ব্যারিস্টারের ঠিকানা জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, কত লোক আসছে হোটেলে, সকলের ঠিকানা মনে রাখা কি সম্ভব? তিনি মিথ্যে কথা বলছেন বুঝতে পারলাম। হোটেলে ঘর নিলেই রেজিস্টারে ঠিকানা লিখতে হয়; মনে রাখবার তো কোন প্রয়োজন নেই। রেজিস্টারের পাতা ওল্টালেই ঠিকানা পাওয়া যেত। আসলে ব্যারিস্টারের ঠিকানা তিনি দিতে চান না। অগত্যা আমায় কলকাতা ছুটতে হল। হোমিসাইড স্কোয়ার্ডের মিস্টার সামন্ত আমাকে অনেক সাহায্য করলেন। তিনি হাইকোর্ট-বার থেকে ব্যারিস্টারের ঠিকানা সংগ্রহ করলেন। আমরা দুজন গেলাম তাঁর বাড়ি। পুলিশ বড় ভয়ঙ্কর জিনিস, তাদের ভয় করে চলে না, এমন লোকের সংখ্যা হাতে গোণা যায় বোধ হয়। ব্যারিস্টার সাহেব আমার ও সামন্তর জেরার মুখে পড়লেন। খুনের কেসে জড়িয়ে পড়বার ভয়ে শেষ পর্যন্ত বললেন সব কথা। দিলীপ মুখার্জির সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের চেনা-জানা। এগারো হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন একবার দায়ে পড়ে। টাকাটা শোধ করতে না পারায় নানা অ্যাডভান্টেজ নিয়ে চলেছেন তাঁর ওপর দিলীপ। গত বছর তার করে ডাকিয়ে পাঠালেন নৈনিতালে। রক্তিমা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর আড়ালে বললেন, ওই

মেয়েটিকে হোটেলে পার্মানেণ্টলি রাখতে হবে, প্রচুর ধনী বোর্ডার পাওয়া যাবে তাহলে। আমি প্রপোজ করতে পারছি না, আপনি ওকে তাতান।

ব্যারিস্টার সাহেব রক্তিমার সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করলেন। রক্তিমা ভাবলেন, ধনী মক্কেল হাতে এসেছে। ক্রমে আসল কথাটা বলা হল। শুধু বোর্ডারদের কাছে দেহ বিক্রয় নয়, চোরাই মদের চালানের ব্যাপারেও সহযোগিতা করতে হবে—নিজের প্রাইভেট চেম্বারে দিলীপ বুঝিয়ে বললেন সব। লাভের কথাটাও তুললেন। রক্তিমা ও-পথ মাড়ালেন না। অসম্ভব রাগারাগি হয়ে গেল দুজনের মধ্যে। বহুবল্লভা নারীর উক্তি হল, অসংখ্য পুরুষের সঙ্গে রাতের পর রাত অতিবাহিত করা অভ্যাস নেই। একজন অর্থশালীকে আঁকড়ে থাকতেই সে অভ্যস্ত। মৃগাঙ্ক আর দশজনের মত ব্যাপারটাকে অন্য চোখে দেখলেন। ব্যারিস্টারকে নিজের প্রতিপক্ষ মনে করে ঝগড়া-ঝাঁটি বাঁধিয়ে তুললেন। আমার দৃঢ় ধারণা রক্তিমা দেবী নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে এনেছিলেন। এবার নৈনিতালে এসেই তিনি মুখার্জিকে ব্ল্যাকমেলিং করতে আরম্ভ করলেন। টাকা দাও, নয়তো চোরাই মদের কথাটা ফাঁস করে দেব। বিপদে পড়লেন মুখার্জি, অগত্যা তাঁকে এই সঙ্গীন পথটা বেছে নিতে হল। তাঁরই কর্মচারির হাত দিয়ে অ্যাসিড আনিয়ে ছিলেন স্বকুমারবাবু। ঘটনাটা নিশ্চয় মোটামুটি জানা ছিল। সুতরাং পরের ঘাড়ে দোষ চাপাবার চমৎকার একটা ব্যবস্থা হল। ঘটনাটা কিভাবে ঘটেছিল এবার বলি।

বন্ধু কুমার বাহাদুরের ড্রইংরুম থেকে রিভলবারটা সরিয়ে আনতে বিশেষ অসুবিধা হয় নি। নকল চাবির সাহায্যে সুকুমারবাবুর ঘর খুলে অ্যাসিডের বোতল ও পার্স সংগ্রহ করলেন। কুমার বাহাদুরের মুখ থেকেই বোধ হয় শুনে থাকবেন রক্তিমা দেবী তাঁর সঙ্গে পালিয়ে যেতে চায়। রাত্রে এই কারণে দেখা করতে আসবেন, তাও জানা ছিল। ওই অনুপস্থিতির সুযোগে মৃগাঙ্ক ঘোষের বাড়িতে প্রবেশ করেন দিলীপ, এবং তাঁকে আহত করেন। তারপর রক্তিমা দেবী

ফিরে আসতেই দ্রুত কাজ সেরে পিছনের বাউণ্ডারী-ওয়াল টপকে সরে পড়েন।

একটানা এতক্ষণ বলবার পর বাসব থামল।

সাধন বলল, একেই বলে ভাগ্যের ফের। বেশ ব্যবসা করছিলেন ভদ্রলোক, অতি লোভ করতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনলেন। আচ্ছা, সেদিন সকলকে ডাকিয়ে এত কথা বললে কেন? দিলীপবাবুকে কি টেম্পট করলে?

এক্জ্যাক্টলি। দিলীপ মুখার্জি হত্যাকারী নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলেও, তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ তো সংগ্রহ করা যাচ্ছিল না। শেষে বাধ্য হয়ে আমাকে ওই পথ অবলম্বন করতে হল। উনি ঘাবড়ে গেলেন, চাবিওয়ালা বলে দেবেই তাঁর নাম পুলিশের কাছে। আমাব ফাঁদে তিনি পা দিলেন। চাবিওয়ালাকে শেষ করে দিলে সমস্ত দিক রক্ষা পায়। তারপর কি হয়েছে, তা তো তুমি জান সাধন।

কথা শেষ করেই বাসব নতুন করে পাইপ সাজতে আরম্ভ করল।

মধুসূদন গুপ্ত প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ওর মুখের দিকে।

গাড়ির গতি মন্থর হয়ে আসছে, সামনেই আলোকোজ্জ্বল বালিয়া স্টেশন।